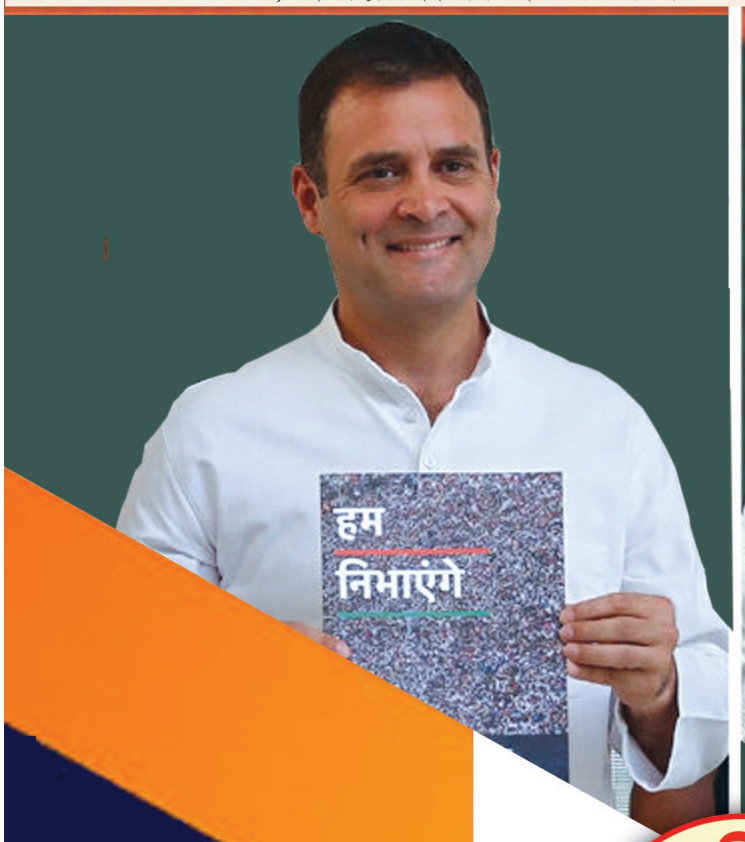
দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

বিজেপির নির্বাচনী ইস্তাহার দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের মার্গদর্শন— পৃঃ ২৪

কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহার ও জাতীয় নিরাপত্তা : এক বিপজ্জনক সম্ভাবনার মুখে গোটা দেশ — পৃঃ ২৮

৭১ বর্ষ, ৩২ সংখ্যা।। ২২ এপ্রিল ২০১৯।। ৮ বৈশাখ - ১৪২৬।। যুগাব্দ ৫১২১।। website : www.eswastika.com





রাজনীতির ইস্তাহার

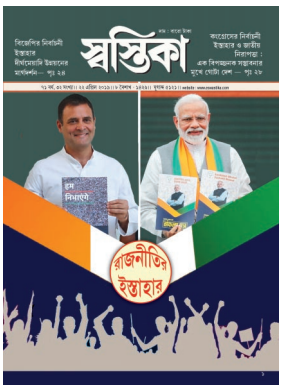
স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭১ বর্ষ ৩২ সংখ্যা, ৮ বৈশাখ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

২২ এপ্রিল - ২০১৯, যুগাব্দ - ৫১২১,

Website : www.eswastika.com



সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

দেশদ্রোহীদের স্বরূপ উন্মোচিত, মোদী-বিরোধিতা অজুহাত মাত্র ▯ বিশ্বামিত্র **▯ ৬**

খোলা চিঠি : দিদি আপনার সেলেব বোনেরা এত রাগছে কেন? ▯ সুন্দর মৌলিক **▯ ৭**

মনুস্মৃতি ও জাতিভেদ প্রথা সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার অবসান প্রয়োজন ▯ ডা: বিবেক আর্য **▯ ৮**

সারা বিশ্ব চায় মোদী আবার ফিরে আসুন ▯ ডা: আর দাস **▯ ১১**

আমি স্বার্থপর, আমি ভোট দেব আমার স্বার্থে ▯ প্রীতীশ তালুকদার **▯ ১৩**

আটশো বছরের বিধর্মী শাসনে হিন্দুরা কেমন ছিল ▯ প্রণব দত্ত মজুমদার **▯ ১৫**

ভারতীয় মহিলার নামে প্রথম রেল স্টেশনের নামকরণ ▯ দেবপ্রসাদ মজুমদার **▯ ১৭**

সংকল্পিত ভারত শক্তিশালী ভারত ▯ ২৩

বিজেপির ইস্তাহার দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের মার্গদর্শন ▯ সনাতন রায় **▯ ২৪**

তৃণমূলের ইস্তাহারে সিপিএমেরই চেনা সুর ▯ অভিমন্যু গুহ **▯ ২৬**

কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহার ও জাতীয় নিরাপত্তা এক বিপজ্জনক সম্ভাবনার মুখে গোটা দেশ ▯ বিমল শঙ্কর নন্দ **▯ ২৮**

বাঙ্গলার লোকশিল্পে শ্রীচৈতন্য ▯ চূড়ামণি হাটি **▯ ৩১**

প্রাণেশ্বর শ্যামাচরণ ▯ অমিত ঘোষ দস্তিদার **▯ ৩৩**

পাকিস্তানে নাবালিকা কন্যাদের করুণ আর্তনাদ কবে শেষ হবে? ▯ রঞ্জন কুমার দে **▯ ৩৫**

ভারতবর্ষে মুক্ত সাংবাদিকতার জনক ছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ▯ সুজয় চট্টোপাধ্যায় **▯ ৩৭**

নোটায় ভোট : দেশ গঠনের পরিপন্থী ▯ দেবযানী ভট্টাচার্য **▯ ৪৩**

সাক্ষাৎকার : ভাগচাষিদের আরও বেশি ক্ষমতায়নে সরকার দায়বদ্ধ ▯ পীযূষ গোয়েল **▯ ৪৫**

উনিশের লোকসভা নির্বাচন শক্তিশালী ভারত নির্মাণের অঙ্গীকার ▯ ড. সুদীপ ঘোষ **▯ ৪৬**

নিয়মিত বিভাগ

উবাচ : ১০ ▯ চিঠিপত্র : ১৯-২০ ▯ অঙ্গনা : ২১ ▯ সুস্বাস্থ্য: ২২ ▯ সমাবেশ-সমাচার : ৩০ ▯ অন্যরকম : ৩৯ ▯ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ▯ সাপ্তাহিক রাশিফল : ৫০

প্রকাশিত হবে
২৯ এপ্রিল
২০১৯

স্বস্তিকা
আগামী সংখ্যা

প্রকাশিত হবে
২৯ এপ্রিল
২০১৯

বিজেপির ভয়ে ভীত তৃণমূল

ভোট ঘোষণার পর থেকেই পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির ওপর আক্রমণের ঘটনা বাড়ছে। ভোট শুরু হতে রাজ্যজুড়ে সেই আক্রমণ যেন ভয়ঙ্কর রূপ নিচ্ছে। দিকে দিকে বিজেপি দপ্তর ভাঙচুর, প্রচারে বাধা, প্ল্যাকার্ড-ফেস্টুন ছিঁড়ে ফেলা, দেওয়াল লিখনে বাধা, এমনকি বিজেপির প্রার্থীদের ওপর হামলার ঘটনাও ঘটছে রাজ্যজুড়ে। বিজেপি-ভীতির কারণেই কি এসব করছে তৃণমূল? উত্তর খোঁজার চেষ্টা করছে স্বস্তিকা।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, এবারের নির্বাচন ক্ষমতালোভী এবং দুর্নীতিগ্রস্ত বিরোধী দলগুলির সঙ্গে ভারতীয় জনতার লড়াই। সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি নিজেকে 'চ্যালেঞ্জার' হিসাবে দাবি করেছেন। আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে সাক্ষাৎকারটি।

এছাড়াও থাকছে এবারের নির্বাচনে কিছু নেতা-নেত্রীর দেশবিরোধী বক্তব্য নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ।

দাম : বারো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

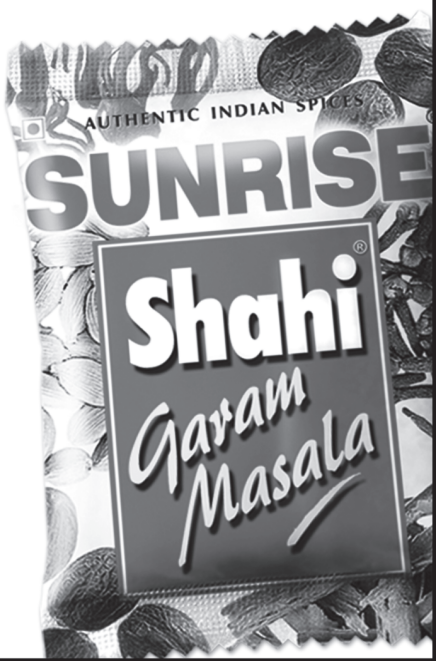
৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : SWASTIKA
A/C. No. : 0314050014429
IFSC Code : UTBI0BIS158
Bank Name :
United Bank of India
Branch : Bidhan Sarani

সানরাইজ®

শাহী গরম মশলা



SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

গণতন্ত্রে ভোটদান একটি পবিত্র কর্তব্য

ভারতীয় গণতন্ত্রের মাহেন্দ্রযোগ লোকসভা ভোট ২০১৯ দেশবাসীর সামনে উপস্থিত হইয়াছে। দেশবাসীর নিকট এই ভোটদান যজ্ঞে আহুতি প্রদান স্বরূপ, যাহা সশক্ত ভারত নির্মাণে ভিত্তিপ্রস্তরের ন্যায় কাজ করিবে। তাই প্রথমেই চিন্তা করিতে হইবে আমাদের ভোট কোনও অযোগ্য ব্যক্তি বা দলের ক্ষেত্রে যেন প্রযোজ্য না হয়। আমাদের ভোট হইবে সশক্ত ভারত নির্মাণের পক্ষে, রাষ্ট্রের সমৃদ্ধির পক্ষে এবং ভারতকে বিশ্বের মহাশক্তিধর রাষ্ট্র নির্মাণের পক্ষে। আমাদের প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে যে, কোনও প্রকার ভয়, লোভ এবং তাৎক্ষণিক স্বার্থে আমাদের ভোট যেন এমন কোনও প্রার্থীর পক্ষে না পড়ে যাহা ভবিষ্যতে দেশের সুরক্ষা, সমৃদ্ধি ও অখণ্ডতার পক্ষে হানিকারক হইবে। আমাদের এই ভোট শুধুমাত্র দেশের সরকারই নির্বাচন করিবে না, দেশের ভবিষ্যৎ এবং দিশাও নির্মাণ করিবে।

আমাদের দেখিতে হইবে কাহারা দীর্ঘ কয়েক দশক ক্ষমতায় থাকিয়াও তাহাদের নির্বাচনী ঘোষণাপত্রে মিথ্যার ফুলঝুরি ঝরাইয়া দেশবাসীকে বোকা বানাইয়া দেশকে দুর্বল থেকে দুর্বলতর করিয়াছে, দান-খয়রাতির রাজনীতি করিয়া কতিপয় লোককে ভিখারি মনোবৃত্তিসম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছে। আমাদের বুঝিতে হইবে কাহারা ক্ষমতাসীন থাকার পর্বে আর্থিক কেলেঙ্কারির পর কেলেঙ্কারি করিয়া দেশকে আর্থিক ভাবে পঙ্গু করিয়া ফেলিয়াছিল। বিশ্বসভায় ভারতের মাথা নীচু করিয়া দিয়াছিল। দেখিতে হইবে, কোন সেই আঞ্চলিক দল পুনরায় নির্বাচনী ঘোষণাপত্রে দেশকে দুর্বল করিবার নীতি ঘোষণা করিয়াছে। আরও দেখিতে হইবে, নির্বাচনী ঘোষণাপত্রের প্রারম্ভেই কাহারা অন্য একটি রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার শুরু করিয়াছে, শেষও করিয়াছে তাহারা বিষোদ্গার দিয়াই। এই আঞ্চলিক দলটির লক্ষ্যই হইল কেন্দ্র বিরোধিতা, রাজ্যবাসীর উন্নয়ন নহে। কেন্দ্র বিরোধিতা করিতে করিতে তাহারা শালীনতার সমস্ত সীমাই উল্লঙ্ঘন করিয়া ফেলিয়াছে।

আমাদের অবশ্যই দেখিতে হইবে, কাহারা নির্বাচনী ঘোষণাপত্রকে সংকল্পপত্র নাম দিয়াছে। বিগত পাঁচ বৎসরে কাহারা তাহাদের প্রতিশ্রুতির অধিক কার্য সমাধা করিয়াছে। কাহারা দেশ ও জাতির মানোন্নয়নে আন্তরিক ও সংকল্পবদ্ধ। আমাদের ভাবিতে হইবে, আমার ভোট এমন এক সরকারের জন্য হইবে যাহারা শত্রুদেশে প্রবেশ করিয়া তাহাদের মুখের উপর জবাব দিতে পারে, যাহারা আমেরিকা, চীন প্রভৃতি মহাশক্তিধর দেশের চোখে চোখ রাখিয়া কথা বলিতে পারে। আমাদের ভাবিতে হইবে, বিকাশ ও সমৃদ্ধির পথে দেশের যে অগ্রগতি ঘটিতেছে তাহা যেন মন্থর না হইয়া পড়ে। আমাদের বুঝিতে হইবে, ইহার জন্য আগামী পাঁচ বৎসর এক শক্তিশালী ও নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকারের আবশ্যকতা রহিয়াছে। দেশবিরোধী শক্তিগুলির প্রভাবে এবং ক্ষমতার লালসায় বিচ্ছিন্নতাবাদ, তোষণনীতি, জাতপাত ইত্যাদির রাজনীতি করিয়া ভোটদাতাদের প্রভাবিত করিবার চেষ্টা চলিবে। একটি বিশেষ গোষ্ঠী যাহাদের উদয় ঘটিয়াছে ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের প্রাকমুহূর্তে, তাহারা দেশের অগ্রগতি রুদ্ধ করিবার মানসে কাহাকেও ভোট না দিবার অর্থাৎ নোটা প্রয়োগ করিবার প্রচার চালাইতেছে, কিন্তু আমাদের বিবেক ও বুদ্ধির দ্বারা চালিত হইয়া এমন একটি সরকারকে নির্বাচন করিতে হইবে যাহারা গরিব, কৃষক, কর্মচারী এবং মহিলাদের কল্যাণ করিতে পারে। সেই সঙ্গে সেনাবাহিনীর স্বাভিমান রক্ষা করিয়া ভ্রষ্টাচার ও ভ্রষ্টাচারীদের কঠোর শাস্তি প্রদান করিতে পারে। গণতন্ত্রের এই মহা যজ্ঞে দেশের কল্যাণকে মাথায় রাখিয়া একশত ভাগ ভোটদান করিয়া রাষ্ট্রসচেতন দেশভক্ত নাগরিক হিসাবে নিজেকে প্রমাণ করিতে হইবে। ইহা প্রত্যেক দেশবাসীর পবিত্র কর্তব্য।

সুভাষিতম্

কালঃ পচতি ভূতানি কালঃ সংহরতে প্রজাঃ।
কালঃ সুপ্তেষু জাগর্তি কালো হি দুরতিক্রমঃ।।

কালই মানুষকে পরিণত করে। কালই সংহার করে মানুষকে। সকলে যখন ঘুমে মগ্ন তখন কালই একমাত্র জেগে থাকে। অতএব কালকে অতিক্রম করা দুঃসাধ্য।

দেশদ্রোহীদের স্বরূপ উন্মোচিত মোদী-বিরোধিতা অজুহাত মাত্র

বিশ্বামিত্রের কলম

দ্বেষপ্রেমীদের মুখপত্র একটি সংবাদপত্রের 'দেশদ্রোহী' সম্পাদকমশাই তাঁর সম্পাদকীয় স্তম্ভে খোলাখুলি ঘোষণা করে দিয়েছিলেন মোদী জমানায় 'দেশদ্রোহ' শব্দটি বিশেষ গৌরববাচক, সুতরাং দেশদ্রোহী তকমায় তাঁরাই খুশিই হবেন। নেহাত ব্যঙ্গার্থে বলা, কিন্তু মনের জানলা তিনি দু'হাট করে খুলে দিয়েছিলেন। এঁদের বৌদ্ধিক তাণ্ডবের মাতব্বরির সাক্ষী হয়ে রইল এবারের বাঙ্গালির নববর্ষ। শোনা যায়, স্বদেশের প্রতি এঁদের যতই বিদ্রোহ বা বিতৃষ্ণা থাকুক না, আন্তর্জাতিকতার প্রতি এঁরা খুবই অনুরক্ত। সেই অনুরাগের বশেই সম্ভবত 'দেশদ্রোহী', ও 'জাতীয়তাবাদ বিরোধী' আন্তর্জাতিকতাবাদীরা বাঙ্গালির জাতিসত্তাকে সজীব করে তুলতে চেয়েছেন।

যেমন ধরা যাক বাঙ্গালিরা কেন ভারতবাসী হবেন? বাঙ্গালির একমাত্র ঠাঁই হলো গিয়ে বাংলাদেশ। অথচ কী মুশকিল দেখুন বাংলাদেশের 'বাঙালি' সংস্কৃতির সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের 'বাঙ্গালি' সংস্কৃতি আদপেই মেলে না। যদিও পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী উভয় বাঙ্গালি সংস্কৃতিকে মেলাবার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন, 'রামধনু'কে 'রংধনু', 'প্রণামে'র সঙ্গে 'সালাম' ইত্যাদি যোগ করে, তবুও যেন কোথাও অপূর্ণতা রয়ে গিয়েছে। এ রাজ্যের বামমনস্ক তৃণমূলপন্থী বিশিষ্ট 'বুদ্ধিজীবী' মহলের এমত পরিস্থিতিতে আর চুপ থাকা সাজে না।

তাঁরা সঠিকভাবেই বিষয়টির মূলে ঢুকে পড়েছেন। বাংলাদেশের প্রকৃত বুদ্ধিজীবী শাহরিয়র কবীর একদা বলেছিলেন, রবীন্দ্রসংগীত কেবল বাংলাদেশিদের জাতীয় সংগীত রূপেই রয়ে গিয়েছে। বাংলাদেশিরা ভারতবংশীয় সংস্কৃতিকে গ্রহণ করার পরিবর্তে আরবীয় সংস্কৃতিকে গ্রহণ করেছে। তাঁর কথার প্রমাণ দিয়েছিলেন শামসুজ্জামান খান, সৈয়দ আশরাফ আলি, সিরাজুল ইসলাম, আহমেদ জামালের মতো ইসলামি বুদ্ধিজীবীরা। মূলত তাঁদেরই আবিষ্কার ছিল মোগল সম্রাট আকবর, কিংবা নিদেনপক্ষে বাংলার আফগান সুলতান হুসেন শাহ-ই 'বঙ্গাব্দ'-এর প্রতিষ্ঠাতা। যদিও আকবর-হুসেন শাহ-এর রাজত্ব কমবেশি পাঁচশো বছরের, আর বঙ্গাব্দের প্রাচীনত্ব ১৪২৬ বছরের। হিসেবে জল মানে একবারে সাগর পড়লো একেবারে খোদ হজরত মহম্মদের মক্কা থেকে মদিনাযাত্রা, ইসলামি বর্ষপঞ্জি হিজরির সঙ্গে মেলাতে গিয়ে। যাইহোক, এপার বাংলার 'দেশদ্রোহী' বুদ্ধিজীবীরা যথেষ্ট গর্বে'র সঙ্গে ওপার বাংলার ইসলামি সংস্কৃতিকে মান্যতা দিয়ে আকবর বঙ্গাব্দের প্রতিষ্ঠাতা যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে এরাজ্যেও চালিয়ে দিয়েছেন।

সত্যিই তো, এই একবিংশ শতাব্দীর ইসলামিক বাংলায় দাঁড়িয়ে শত্রুরাষ্ট্র হিসেবে যদি কারোকে চিহ্নিত করতেই হয়, তবে তো তা অবশ্যই ভারত। একুশে ফেব্রুয়ারি ভাষা দিবস পালন করা বাঙ্গালির জাতীয় কর্তব্য। হিন্দু শব্দটি এখানে মহা-ঘৃণিত কোনও সন্দেহ নেই, আরবি-উর্দু অবশ্যই মহা পবিত্র। ১৯৪৬-৪৭-এর পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছেন বলে যাঁরা চিল্লাচ্ছেন, তাঁরা বোধহয় বাঙ্গালির শত্রু, পশ্চিমবঙ্গের জন্মদাতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নির্ঘাত মানস- সন্তান, ইসলামিক বাঙ্গলায় এদের ঠাঁই হবে না নিশ্চয়ই।

তবে শুধু বাঙ্গালি ক্যালেন্ডারেই নয়, ইসলামিক বাঙ্গলার মহা শত্রু হিসেবে উদ্ভব হয়েছে রামনবমীর। আমাদের ইসলামপন্থী, বামমার্গী বুদ্ধিজীবীরা এটা বোঝাতে চেষ্টার কোনও ত্রুটি করেননি যে ওসব রামনবমী-বৈশাখি বাঙ্গলার ঐতিহ্য নয়। মক্কা-মন্দিনা বরং বাঙ্গলার ঐতিহ্য হতে পারে, রামমন্দির কখনোই নয়। আরবি সংস্কৃতি আমাদের আপন হতে পারে, হিন্দু সংস্কৃতি নয়। সুতরাং কালচার বিগর্হিত কাজ হয়েছে বাঙ্গলায় রামনবমী পালন করতে দিয়ে, পশ্চিমবঙ্গকে যখন ভারতে থেকেই স্রেফ 'বাংলা'য় পরিণত করার চক্রান্ত চলছে, তখন 'বাংলা' 'বাংলাদেশ'-এ মিশে গেলেই ভারতবর্ষের দেশদ্রোহীদের 'দেশপ্রেম' আবার নিশ্চয়ই চেপে উঠবে। ইসলামি বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের দৌলতে বাঙ্গালির জাতীয়তাবাদ এখন আরবীয় জাতীয়তা-বাদের দিকে ঝুঁকতে শুরু করেছে, অনেকটা 'কাশ্মীরি জাতীয়তাবাদের' মতোই।

এই পরিস্থিতিতে সচেতন নাগরিকের কিছু দায়িত্ব কর্তব্য থেকে যায়। রামমন্দির যেভাবে একদা বাবরি মসজিদে পরিণত হয়েছিল, আজ রাজা শশাঙ্কের বঙ্গাব্দও ঠিক একইভাবে আকবরের বঙ্গাব্দে পরিণত করার অপচেষ্টা হচ্ছে, পূর্ববঙ্গ যেমন একদা পূর্বপাকিস্তান (পরে বাংলাদেশ)-এ পরিণত হয়েছিল, আজ পশ্চিমবঙ্গকেও সেইভাবে ইসলামিস্তানে পরিণত করার চেষ্টা হচ্ছে। সুতরাং মোদী বিরোধিতা অজুহাত মাত্র, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষাও ছল-ছুতো, বাঙ্গালি বাঙ্গলার সংস্কৃতি ভুলে ইসলামের দাসত্ব করুক (তাই বোধহয় 'হিন্দুত্ব' শব্দটিতে ইসলামপন্থীদের এত আতঙ্ক), কমিউনিস্ট-ইসলামিস্ট যোগের এই মনোগত ইচ্ছার প্রতিফলন বিজেপি- বিরোধিতার, আর এস এস বিরোধিতার বেড়া দিয়ে আড়াল করতে হচ্ছে। দেশদ্রোহীদের চিনতে আর কারোর বাকি থাকছে না।

■

দিদি আপনার সেলেব বোনেরা এত রাগছেন কেন?

মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
তৃণমূলনেত্রী

চৈত্রের শেষ দিক থেকেই চড়তে শুরু করেছে পারদ। পয়লা বৈশাখের সকাল থেকেই জ্বালাপোড়া গরম। এর মধ্যেই চলছে ভোটের প্রচার। একে গরম, তার উপর এত হাঁটাহাঁটি। মেজাজ কী আর ঠিক থাকে! যাদবপুর কেন্দ্রের সেলিব্রিটি প্রার্থী মিমি চক্রবর্তী এবং কৃষ্ণনগর কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী মহুয়া মৈত্র, দু'জনেই দলীয় মঞ্চে হারিয়ে ফেললেন মেজাজ। একজন গলা সপ্তমে তুলে বললেন, ''আমি আপনাদের জন্য কাজ করতে এসেছি। আমার নিজের কোনও স্বার্থ নেই। এটা সবার মাথায় গেঁথে নিন।'' আর অন্যজন বললেন, ''যত বেয়াদপ চ্যাংড়া এখানে আছে, বেশি কথা বলছে— হয় ভোট করো নয় বাড়ি যাও।''

কয়েকদিন আগেই মিমির ভিডিও ফুটেজ ছড়িয়ে গিয়েছিল সোশ্যাল মিডিয়ায়। যাদবপুর কেন্দ্রের একটি কর্মসূচিতে গিয়েছিলেন তিনি। মঞ্চে মিমির বক্তৃতা চলাকালীনই নীচ থেকে কেউ এমন কোনও মন্তব্য করেন, যাতে চটে যান মিমি। তারপর সে কী মেজাজ! পাশে দাঁড়িয়ে থাকা তৃণমূল নেতারাও মুখ চাওয়াচাওয়ি শুরু করে দেন।

যাদবপুরকে এ বারেও ধরে রাখতে সেলেব মুখকে প্রার্থী করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু তাঁর যে এমন 'মুখ' অতি বড়ো তৃণমূলকর্মীরও ধারণার মধ্যে ছিল না। যদিও ওই একবারই। বাকি সময়ে মিমি নিজের সিনেমার গান গেয়ে, জনতাকে এন্টারটেন করেই প্রচার সারছেন।

ওদিকে রেগে ফায়ার হয়ে যান মহুয়া মৈত্রও। পয়লা বৈশাখের দিন প্রচারে বেরিয়েছিলেন কৃষ্ণনগরের তৃণমূল প্রার্থী। দেখা যায় মহুয়ার প্রচারের মাঝেই এক দল তৃণমূলকর্মী মহুয়ার কাছে নালিশ জানাতে শুরু করেন পলাশিপাড়ার তৃণমূল বিধায়ক তাপস সাহার বিরুদ্ধে। ব্যাস! মেজাজ হারিয়ে ফেলেন মহুয়া। বলেন, 'আমি পরিষ্কার কথা বলছি। আমি এমপি ক্যান্ডিডেট, তাপসদা নির্বাচিত এমএলএ। আমি একটা কথাও কারও বিরুদ্ধে শুনতে আসিনি। আমি ভোট করতে এসেছি। যত বেয়াদপ চ্যাংড়া এখানে আছে, বেশি কথা বলেছে, হয় ভোট করো, নয় বাড়ি যাও।''

এমনিতে টেলিভিশন বিতর্কে গলার জোরে বিরোধীদের একাই প্রতিহত করে দেন মহুয়া। কিন্তু দলীয় প্রচারে বেরিয়ে যে এমন করতে হবে তা বোধহয় তিনি নিজেও জানতেন না। কৃষ্ণনগরে এবার প্রার্থী বদল করতে হয়েছে তৃণমূলকে। গত দশ বছরের সংসদ তাপস পালকে আর টিকিট দেননি দিদি। তার উপর রয়েছে বিজেপি জুজু। কৃষ্ণনগর কেন্দ্রে বহু বছর ধরেই গেরুয়া শিবিরের একটা জনভিত্তি রয়েছে। এবার সেখানে বিজেপি প্রার্থী করেছে প্রাক্তন ফুটবলার কল্যাণ চৌবেকে। মহুয়া হয়তো প্রকাশ্যে কলহ দেখেই আর মেজাজ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেনি। ২৯ এপ্রিল ভোট হবে এই কেন্দ্রে। হাতে আর ১৫ দিনও বাকি নেই। এখন যদি দলীয়কর্মীরা একে অপরের নামে নালিশ করেন তাহলে প্রার্থী আর ঠিক থাকেন কী করে!

এখন প্রশ্ন হচ্ছে মিমি বা মহুয়াদের মেজাজ হারাতে হচ্ছে কেন? রাজনৈতিক মহলের মতে, তৃণমূলের ভিতরে পারস্পরিক অবিশ্বাস, কোন্দলই এর অন্যতম কারণ। তাঁদের মতে, যাদবপুরের একটা বড়ো অংশের তৃণমূলকর্মীরা মিমিকে প্রার্থী হিসেবে মানতে পারেননি। ঠিক তেমনই কৃষ্ণনগরেও। নদিয়া জেলার সংগঠনের ভিতরকার দশা বিলক্ষণ জানেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তাই প্রার্থী ঘোষণার পর বেশ কিছুদিন কেটে গেলেও কর্মীরা নামছেন না দেখে, গোটা নদিয়া জেলার নেতাদের নবান্নে ডেকে নিয়েছিলেন মমতা। শান্তিপুরে বিধায়ক অরিন্দম ভট্টাচার্য বনাম চেয়ারম্যান অজয় দে'র লড়াই, ও দিকে চাকদহে রত্না ঘোষ বনাম সেখানকার ব্লক সভাপতির কোন্দল। সব মিলিয়ে এই জেলায় ভিতরকার দ্বন্দ্বেই জেরবার শাসক দল। ভোট এগিয়ে এলেও কোন্দল কমার কোনও নামগন্ধ নেই! প্রার্থীদের চিন্তা তো হবেই। দিদি আপনি মেজাজ হারান ঠিক আছে। এটা আপনাকে মানায়। কিন্তু অনেক স্বপ্ন নিয়ে যে সব সেলেব বোনদের প্রার্থী করেছেন তাঁরা রেগে গেলে তো মহা কেলেঙ্কারি।

— **সুন্দর মৌলিক**

মনুস্মৃতি ও জাতিভেদ প্রথা সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার অবসান প্রয়োজন

অতিথি কলম



ডাঃ বিবেক আর্য

তথাকথিত দলিত নেতা জিগ্নেশ মেওয়ানি দিল্লির একটি অনুষ্ঠানে মনুস্মৃতি ও ভারতীয় সংবিধানের মধ্যে যে কোনও একটিকে বেছে নিতে বলেছেন। আমি এব্যাপারে ১০০ শতাংশ যে উনি ও ওনার মতো লোকেরা কোনোদিনই মনুস্মৃতি পড়ে দেখেননি। বিনা কারণে শুধু চিৎকার করতেই এরা দক্ষ। আমি জিগ্নেশ মেওয়ানিকে চ্যালেঞ্জ করছি এই প্রবন্ধটি পড়ার জন্য এবং তারপর এ সম্পর্কে তার মতামত দেওয়ার জন্য। তিনি আসুন ও মনুস্মৃতির ওপর একটি বিতর্ক হোক। আমি এই মহান কাজের জন্য তাঁকে চ্যালেঞ্জ করছি।

এই প্রবন্ধটি পড়ার পর পাঠকেরাই ঠিক করুন যে ভারতীয় সংবিধান ও মনুস্মৃতি— এই দুটোর মধ্যে তাঁরা কী বেছে নেবেন।

অধিকাংশ পাঠকই হয়তো মনে করেন যে, মনুস্মৃতি জাতিভেদ প্রথাকে সমর্থন করে। তাঁদের ধারণা এতে বলা হয়েছে যে, ব্রাহ্মণ শূদ্রের থেকে শ্রেষ্ঠতর। জাতিভেদ প্রথাকে সমর্থনকারী এই সমস্ত গ্রন্থকে পুড়িয়ে ফেলার কথাও হয়তো অনেকে বলবেন। আমরা এই ব্যাপারটাই অনুসন্ধান করে দেখব যে সাধারণ মানুষের ধারণা, মনুস্মৃতি জাতপাতকে সমর্থন করে—এটা ঠিক কিনা।

ঊনবিংশ শতকের বিখ্যাত বৈদিক পণ্ডিত স্বামী দয়ানন্দ লিখছেন, 'যে অংশটি প্রক্ষিপ্ত (পরবর্তীকালে সংযোজিত) নয়, সেটি বেদের সঙ্গে একই মত পোষণ করে।" তাঁর অভিমত হলো যে, যে মনুস্মৃতিটি আমরা বর্তমানে পড়ি যেটি স্বয়ম্ভু মনু লিখেছিলেন তা পুরোপুরি সে অবস্থায় পাওয়া যায় না। বর্তমান গ্রন্থটিতে স্ববিরোধিতা ও বৈদিক মূল্যবোধের বিরুদ্ধে কিছু কথা কথা আছে বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। যে সমস্ত জায়গায় মানুষের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করে কাউকে কাউকে হীন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে— সেগুলোকে তিনি বাতিল করেছেন।

প্রকৃত সত্য হলো যে, মনু বর্ণ ব্যবস্থার প্রস্তাব দিয়েছিলেন— যা ঠিক হবে ব্যক্তি বিশেষের গুণের ওপর, তার জন্মের ওপর নয়। নীচে মনুস্মৃতির কিছু শ্লোকের অর্থ দেওয়া হলো— যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে জন্মসূত্রে নয়, যোগ্যতার ওপর ভিত্তি করে বর্ণ নির্ধারিত হতো।

২.১৫৭-যেমন কাঠের তৈরি হাতি ও চামড়ার তৈরি মৃগ অকেজো ও অসার, তেমনি যে ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়ন করেন না, তিনিও অপ্রয়োজনীয় ও অসার; ওই তিনটি পদার্থ কেবলমাত্র ওই সমস্ত নাম ধারণ করে (অর্থাৎ নামের যোগ্য প্রয়োজন নির্বাহ তারা করে না)।

২.২৮-বেদধ্যয়ন, ব্রত পালন, যজ্ঞে নৈবেদ্য প্রদান, পবিত্র শাস্ত্র অধ্যয়ন, ত্রিস্তরীয় বিজ্ঞান অধিগত করা, ভগবান, ঋষি ও পিতৃলোকের তর্পণ করা, গৃহস্থ অবস্থায় সন্তান উৎপাদন, বিভিন্ন মহাযজ্ঞ সম্পাদন, সৌত্র আচার পালন প্রভৃতির মাধ্যমে এই মানব শরীর ব্রহ্মের সঙ্গে মিলনের উপযুক্ত হয়।

ওপরের দুটি শ্লোকেই এই বিষয়টির ওপরর জোর দেওয়া হয়েছে যে, শুধুমাত্র ব্রাহ্মণ পিতার ঘরে জন্মগ্রহণ করলেই কেউ ব্রাহ্মণ হয় না; কিছু বিশেষ কাজ তাকে করে নিজেকে যোগ্য করে তুলতে হয়।

কোনো মানুষের বর্ণ (জাতি বা সমাজে অবস্থান) নির্ধারিত হতো তার শিক্ষা সম্পূর্ণ হওয়ার পর।

বৈদিক যুগে একজন মানুষ দু'বার জন্মগ্রহণ করে বলে বিশ্বাস করা হতো। প্রথম, যখন সে তার পিতা-মাতার ঘরে জন্মগ্রহণ করত। দ্বিতীয়, যখন সে তার শিক্ষা সম্পূর্ণ করত। দ্বিতীয় জন্মের (দ্বিজ) পর সেই ব্যক্তির বর্ণ নির্ধারণ করা হতো।

মনুস্মৃতির নীচে উল্লিখিত শ্লোকগুলি ব্যাপারটিকে আরও পরিষ্কার করবে—

২.১৪৮-কিন্তু সেই নবজন্ম যা সমস্ত বৈদিক সাহিত্যে পারদর্শী, আচার্য শাস্ত্র অনুসারে তাকে (ছাত্রকে) দেন সবিতৃর সাহায্যে (গায়ত্রী মন্ত্র দ্বারা), সেই জন্মই প্রকৃত এবং বয়স ও মৃত্যুরহিত।

২.১৪৬- জন্মদাতা পিতা এবং বেদের জ্ঞানদানকারী পিতা— এই দুজনের মধ্যে দ্বিতীয় জনই অধিকতর শ্রদ্ধার অধিকারী পিতা; কারণ বেদের জ্ঞানপ্রাপ্তির দ্বারা যে দ্বিতীয় জন্ম হয় তা শাশ্বত—ইহলোক ও পরলোক উভয় স্থানেই।

যে ব্যক্তি অশিক্ষিত থাকতেন ও বৈদিক জ্ঞান অর্জন করতেন না তাকেই শূদ্র বলা হতো। সুতরাং শূদ্র বর্ণ জন্মের ওপর ভিত্তি করে নয়— কর্মের ওপর ভিত্তি করে স্থির হতো।

১০.৪-ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের দু'বার জন্ম (শিক্ষাগ্রহণ) হয়, কিন্তু চতুর্থ বর্ণ শূদ্রের জন্ম হয় মাত্র একবার, কোনো পঞ্চম বর্ণ হয় না।

২.১৭২-যিনি বৈদিক শিক্ষায় শিক্ষিত হননি, তিনি শূদ্রের ন্যায়।

মনু তথাকথিত নিম্নবর্ণের কোনো মানুষকে অপমান করতেও নিষেধ করেছেন—

৪.১৪১-যাদের দেহে অতিরিক্ত অঙ্গ আছে বা যারা হীনাঙ্গ, যারা বিদ্যাহীন (অশিক্ষিত), যারা অত্যধিক বয়স্ক, যাদের রূপ বা সম্পদ নেই এবং যারা হীন বংশে জন্মে তাদের কখনো অপমান বা ব্যঙ্গ করবে না।

তাহলে মনু কেন বর্ণ ব্যবস্থা শুরু করলেন?

১.৩১-কিন্তু এই বিশ্বের সমৃদ্ধির জন্য তিনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বর্ণের সৃষ্টি করলেন সমাজরূপ দেহের যথাক্রমে মাথা, বাহু, জঙ্ঘা এবং পদ রূপে।

(লক্ষণীয় যে, এখানে কিন্তু ভগবানের পদদ্বয় থেকে শূদ্রের উৎপত্তি সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি।)

১.৮৭-এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রক্ষার জন্য তিনি (ঈশ্বর) সকলের জন্য পৃথক কর্তব্য স্থির করে দেন, যেমন কোনো দেহের ক্ষেত্রে মুখ, বাহু, জঙ্ঘা ও পদদ্বয় করে থাকে।

১.৯৮-ব্রাহ্মণদের জন্য তিনি স্থির করেছেন যে, শিক্ষাদান করা ও অধ্যয়ন করা, নিজের ও অপরের ভালোর জন্য

ত্যাগ করা এবং দান গ্রহণ করা ও দান করা।

১.৮৯-ক্ষত্রিয়দের জন্য তাঁর আদেশ হলো প্রজা রক্ষা করা, দান করা, অধ্যয়ন করা এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণতা থেকে বিরত থাকা।

১.৯০-শূদ্রের জন্য প্রভু একটিই পেশা ঠিক করে দিয়েছেন— কোনো অসূয়া ছাড়া পূর্বোক্ত বর্ণগুলির শুশ্রূষা করা।

যেসমস্ত মানুষের কোনো দক্ষতা বা জ্ঞান নেই মনু তাদেরই শূদ্র বলে মনে করেছেন। সুতরাং এই অদক্ষ ও অশিক্ষিত মানুষদেরই অন্যান্য দক্ষ, শিক্ষিত মানুষদের তত্ত্বাবধানে কাজ করার কথা মনু বলেছেন। আমরা বর্তমান যুগেও ঠিক এইভাবেই কাজ করি না কি?

মনু মানুষকে তাঁর নিজের বর্ণ অতিক্রম করে ওপরের বর্ণে উত্তরণের প্রচেষ্টা করতে বলেছেন। ফলে বোঝা যায় এই বর্ণব্যবস্থা ছিল পরিবর্তনশীল এবং তা জন্ম নয়, কর্মের ওপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হতো।

১০.৬৫-এইভাবে একজন শূদ্র ব্রাহ্মণ হতে পারে, (একইভাবে) একজন ব্রাহ্মণ শূদ্রের পর্যায়ে নামতে পারে; এই একই জিনিস ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সন্তানদের ক্ষেত্রেও খাটে।

৯.৩৩৫-একজন শূদ্র যে পবিত্র, উৎকৃষ্টতরদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে, বিনীত কথা বলে, ব্রাহ্মণদের শরণে থাকে সে উচ্চ বর্ণ লাভ করে তার গুণের জন্য।

৪.২২৫-একজন ব্রাহ্মণ যিনি সর্বদা উৎকৃষ্ট মানুষদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন ও নিকৃষ্টদের দূরে রাখেন তিনি হন অত্যন্ত সম্মাননীয়, আর যিনি ঠিক এর বিপরীতটা করেন তিনি শূদ্রের পর্যায়ে নেমে আসেন।

আমরা তো এখনো বলে থাকি মানুষের সঙ্গীই তাকে ভালো বা খারাপ বানায়।

২.১০৩-কিন্তু তিনি যিনি সকালে পূজা করেন না, সন্ধ্যাতেও করেন না, সে একজন শূদ্রেরই ন্যায়, তাকে শূদ্রের মতোই সমস্ত রকম কর্তব্য থেকে অব্যাহতি দেওয়া উচিত ও আর্য (বিভিন্ন গুণাবলীর অধিকারী) হওয়ার অধিকারও কেড়ে নেওয়া উচিত।

২.১৬৮-একজন দু'বার জন্মগ্রহণ করা মানুষ (দ্বিজ) যিনি বেদ পড়েননি, কিন্তু অন্যান্য ঐহিক বিষয়ে পড়াশোনা করেছেন, তিনি তাঁর জীবদ্দশাতেই শূদ্রের পর্যায়ে পতিত হন এবং তাঁর পরবর্তীকালে তাঁর বংশধররাও।

২.১২৬-যে ব্রাহ্মণ অভিবাদনের উত্তরে প্রত্যাভিবাদন জানান না, শিক্ষিত মানুষদের তাঁকে অভিবাদন জানানো উচিত নয়, তাঁকেও শূদ্রের পর্যায়ভুক্ত হিসাবেই ধরা উচিত।

একজন শূদ্রও অন্যান্য বর্ণের লোকেদের শিক্ষা দিতে পারে।

২.১৩৮-একজন শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি তথাকথিত নিচু বর্ণের থেকেও শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে, নীচুতম বর্ণের থেকেও শ্রেষ্ঠ জ্ঞান লাভ করতে পারে এবং নিজের থেকে নীচু বর্ণ থেকেও উত্তমা স্ত্রী বিবাহের মাধ্যমে গ্রহণ করতে পারে।

২.২৪১-আপৎকালে কোনো ব্রাহ্মণ ছাত্র ব্রাহ্মণেতর অধ্যাপকের কাছ থেকেও অধ্যয়ন করতে পারবে, আর যতদিন ওই অব্রাহ্মণ অধ্যাপকের কাছে অধ্যয়ন করবে, ততদিন অনুব্রজ্যারূপে শুশ্রূষা করা চলবে।

উচ্চতর বর্ণের বিভিন্ন অধিকারও মনু অনেক ক্ষেত্রে শূদ্রদের দিয়েছেন।

২.১৩৬-ধন-সম্পদ, নিকট আত্মীয়, বয়স্ক মানুষ, বিভিন্ন ধর্মসম্মত কর্ম ও আচার পালন এবং বিদ্যা (বৈদিক জ্ঞান)-এই পাঁচটি সম্মানের কারণ; কিন্তু প্রত্যেকটির থেকে তার পরেরটি বেশি সম্মানের কারণ বলে জানবে।

২.১৩৭-এই পাঁচটি গুণের মধ্যে ওপরের তিনটি বর্ণের মানুষদের যত বেশি গুণ থাকবে, তিনি তত বেশি মান্য হবেন, আর শূদ্র নব্বই বছরের বেশি বয়স্ক হলে ব্রাহ্মণসহ সকলের মান্য হবেন।

অর্থাৎ মনু এখানে শূদ্রদেরও মান্যতার কথা বলেছেন।

৩.১১৬-ব্রাহ্মণদের পর আত্মীয়স্বজন ও ভৃত্যরা খাবে এবং এর পরে অবশিষ্ট যা থাকবে তা গৃহস্থ ও তাঁর স্ত্রী খাবেন।

তো এখানে মনু গৃহস্থদের নির্দেশ দিয়েছেন ভৃত্যদের (মূলত যারা শূদ্র হতো) পরে খাদ্য গ্রহণ করতে।

৮.৩৩৫-সাধারণ মানুষের যেখানে এক কার্ষাপণ দণ্ড, সেরকম ক্ষেত্রে রাজার দণ্ড হবে ১০০০ কার্ষাপণ— এটাই স্মৃতিশাস্ত্রের বিধান।

৮.৩৩৭-৮.৩৩৮-চুরির ক্ষেত্রে চৌর্যের দোষ-গুণ সম্পর্কে অবহিত শূদ্রের পাপ হবে আট গুণ, বৈশ্যর ষোলো গুণ, ক্ষত্রিয়ের বত্রিশ গুণ এবং ব্রাহ্মণের ৬৪ গুণ বা ১০০ গুণ-অপরাধের গুরুত্ব বিচার করে। অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে একই অপরাধ হলেও মনু উচ্চবর্ণের জন্য বেশি শাস্তির বিধান দিয়েছেন।

এই লেখাটিতে সমাজ কাঠামো সম্পর্কে মনুর নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিকেই তুলে ধরা হলো। তাঁর কাছে শিক্ষিত মানুষের ব্যবহারিক ত্রুটি, একজন অশিক্ষিত মানুষের থেকে বেশি ক্ষমার অযোগ্য।

প্রাচীনকালে বর্ণব্যবস্থা পরিবর্তনের কিছু উদাহরণ—

১। ঋষি ব্রহ্মার পুত্র মনু স্বয়ম্ভু নিজেই ব্রাহ্মণের পুত্র হয়েও ক্ষত্রিয় রাজায় পরিণত হন।

২। মনুর জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিয়ব্রত একজন রাজা হন অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ে পরিণত হন।

৩। মনুর দশ পুত্রের মধ্যে সাতজন রাজা হন এবং বাকি তিনজন ব্রাহ্মণ। তাঁদের নাম হলো মহাবীর, কবি ও শাওল (ভাগবত পুরাণ, নবম অধ্যায়)।

৪। কবস আইলুশ শূদ্র হিসাবে জন্মগ্রহণ করেন এবং পরবর্তীকালে ঋষি হয়ে যান। তিনি ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের বেশ কিছু সূক্ত রচনা করেছেন।

৫। জাবালার পুত্র সত্যকাম, যাঁর পিতৃপরিচয় অজ্ঞাত, তিনিও নিজের গুণবলে ঋষি হন।

৬। নীচু বর্ণে জন্মগ্রহণ করেও মাতঙ্গ ঋষি হন।

৭। নীচু বর্ণে জন্ম হলেও মহাঋষি বাল্মীকিও পরবর্তীকালে ঋষি হন।

৮। মহাত্মা বিদুর দাসীর সন্তান হয়েও রাজা ধৃতরাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী হন।

৯। রাজা বিশ্বনাথ যিনি ছিলেন একজন ক্ষত্রিয়, সাধনবলে তিনি ব্রাহ্মণ তিনি ব্রাহ্মণে পরিণত হন এবং ঋষি বিশ্বামিত্র হিসেবে পরিচিত হন।

একই রকম ভাবে বর্ণব্যবস্থায় পতিত হওয়ারও বহু উদাহরণ আছে—

১। ব্রাহ্মণ ঋষি পুলস্ত্যের পুত্র লঙ্কার রাজা রাবণ রাক্ষসে পরিণত হন।

২। শ্রীরামের পূর্বপুরুষ রাজা রঘুর পুত্র প্রবিধ গুণের অভাবের জন্য নিম্নতর বর্ণ হিসাবে ঘোষিত হন।

৩। শ্রীরামের পূর্বপুরুষ রাজা সমরের পুত্র অসমঞ্জস বিবিধ বাজে গুণের জন্য শূদ্র হিসাবে ঘোষিত হন।

এই আলোচনা থেকে এটা পরিষ্কার যে প্রকৃত, প্রাচীন মনুস্মৃতিতে গুণের বা কর্মের ওপর ভিত্তি করে বর্ণব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে, জন্মের ওপর ভিত্তি করে নয়। পরবর্তীকালে সংযোজিত এই পুস্তকের অংশগুলি তাই পরিত্যাজ।

রম্যরচনা

সিন্ডিকের মশলার ব্রিজ

ফ্লাইওভারের মুখে এসে ক্যাবের ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করল, 'স্যর, ব্রিজের উপর দিয়ে যাবেন না নীচ দিয়ে যাবেন?' মহা সমস্যায় পড়লেন সওয়ারি ভদ্রলোক। সিন্ডিকেটের মশলায় তৈরি ফাটল ধরা, তাপ্পি মারা পুরনো ব্রিজ। ভেঙে পড়তেই পারে। ভেঙে পড়লে বেওয়ারিশ লাশ হয়ে লাশকাটা ঘরে পড়ে থাকতে হবে। কথাটা হচ্ছে উপর দিয়ে যাবেন না নীচ দিয়ে। নীচ দিয়ে গেলে বডি তো আর কেউ পাবে না, দুদিন পরে কংক্রিটের গায়ে থ্যাঁতলান টম্যাটোর মতো মাংসের সস্ হয়ে থেকে যাবেন। বাড়ির লোককেও বডি না পেলে সাত বছর অপেক্ষা করতে হবে এল আই সি-র টাকা পেতে।

বলেই ফেললেন— উপর দিয়ে। দেখলেন, প্রচুর গাড়ি ব্রিজে ওঠার লম্বা লাইনে। নীচটা পুরো ফাঁকা। অনেকদিন পর একটা সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পেরে ভদ্রলোকের মনটা হাল্কা হয়ে গেল। বউকে ফোন করে বলে দিলেন, ব্রিজে উঠছি। আধ ঘণ্টা পরেও ফোনে না পেলে টিভির নিউজটা দেখবে। আর এলআইসি-র কাগজ আলমারির উপরের তাকে ডান দিকে বাদামি খামের মধ্যে আছে।



উবাচ

"রাম তো রাজা ছিলেন, তাঁকে নিয়ে রাজনীতি করবো না তো কাকে নিয়ে করবো? এখানে আল্লাকে নিয়ে রাজনীতি হচ্ছে কেন? এটা রামের দেশ। এখানে রামকে নিয়ে আমরা হাজারবার রাজনীতি করব।"



দিপীপ ঘোষ
রাজ্য বিজেপি সভাপতি

খড়্গপুরে রামনবমী শোভাযাত্রায় অংশ নিয়ে বক্তব্যে

"দেশ জুড়ে নাগরিকত্ব বিল নিয়ে দ্বিচারিতা চলছে। বিল লোকসভায় পাশ হলেও রাজ্যসভায় বিরোধীরা পাশ হতে দেয়নি। কেন্দ্রে আবার বিজেপি সরকার এলে প্রতিশ্রুতি মতো এই বিল পাশ হবে।"



সুবোধ বিশ্বাস
নিখিল ভারত বাঙ্গালি উদ্বাস্তু সমন্বয় সমিতির সভাপতি

কলকাতায় প্রেসক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনে

"পণ্ডিতরা কাশ্মীর ছেড়ে গিয়েছেন কংগ্রেসের নীতির জন্য। কংগ্রেস ও তাদের সহযোগীরা ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতির জন্য কাশ্মীরি পণ্ডিতদের ইস্যুকে গুরুত্ব দেয়নি।"



নরেন্দ্র মোদী
ভারতের প্রধানমন্ত্রী

নির্বাচনী প্রচারে জম্মুর কাঠুয়ায়

"মুলায়ম ভাই, সমাজবাদী পার্টির আপনি পিতামহ। আপনার সামনে রামপুরে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ হচ্ছে। আপনি ভীষ্মের মতো মৌন থাকার ভুল করবেন না।"



সুষমা স্বরাজ
ভারতের বিদেশমন্ত্রী

আজম খানের জয়াপ্রদাকে কুৎসিত মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে

সারা বিশ্ব চায় মোদী আবার ফিরে আসুন

ডাঃ আর দাস

২০১৪-র ২৬ মে নরেন্দ্র মোদী তাঁর শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে দক্ষিণ এশিয়া তথা তিব্বতের নির্বাসিত রাষ্ট্রপ্রধানকে বিশেষ অতিথি হিসেবে নিমন্ত্রণ করে সারা বিশ্বকে আশ্চর্যান্বিত করেছিলেন। সবাই ভেবে ছিলেন এই গুজরাটিটি ব্যবসা ছাড়া আর কী বোঝে!

মোদী যে রাষ্ট্রবাদী হিন্দু, সেটা এখন সারাবিশ্ব জেনে গেছে। তাই ভারতের বাইরে পাকিস্তান ও চীন আর দেশের মধ্যে হিন্দুবিরোধী কংগ্রেস, কমিউনিস্ট ও মহাগঠবন্ধনের নেতা-নেত্রীরা প্রাণপণে চেষ্টা করছে কীভাবে ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে মোদীকে গদিচ্যুত করা যায়! এটা আর এক মহাভারতের যুদ্ধ। সত্য, দেশপ্রেম ও ধর্ম একদিকে, আর অন্যদিকে সম্মিলিত 'ব্রেকিং ইন্ডিয়া ফোর্স' ও অধর্মের মহাসমর। গত পাঁচ বছরে মোদী অসংখ্য জনহিতকারী কাজ করেছেন। উরি আর পুলওয়ামার বদলা নিয়েছেন যা অভূতপূর্ব। ভারতের বায়ুসেনা মায়ানমার ও পাকিস্তানের সীমানা পেরিয়ে জঙ্গি শিবিরগুলি গুড়িয়ে দেওয়ায় পাকিস্তান, চীন এমনকী বিশ্বের বৃহৎ শক্তিগুলির কাছেও এই অভিযান ছিল বিস্ময়কর। সুপারসোনিক মিসাইল অগ্নি-৫-র সফল পরীক্ষণ, অন্তরীক্ষে উপগ্রহকে ধ্বংস করার ক্ষমতা, একসঙ্গে ১০০টির বেশি দেশি-বিদেশি কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে নিক্ষেপ করার বাহাদুরি ভারতের বাহুবলের নিদর্শন, যা মোদীর দ্বারাই সম্ভব হয়েছে। এহেন দেশভক্ত মোদীর শত্রুর সংখ্যা মিত্রের চেয়ে অনেক বেশি হয়েছে।

জিএসটি এবং বিমুদ্রীকরণের মতো দুর্নীতিরোধক শক্তিশালী পদক্ষেপ নিয়ে মোদী ভারতের আর্থিক সঙ্গতি অনেকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছেন। আজ ভারত 'স্কিল ইন্ডিয়া' ও 'স্টার্ট-আপ ইন্ডিয়ার' সাহায্যে বিশ্বের দ্বিতীয় স্মার্টফোন ও অটোমোবাইল উৎপাদক দেশের শিরোপা পেয়েছে। এশিয়ার সবচেয়ে দ্রুতগতি সম্পন্ন এবং বিশ্বের ষষ্ঠ অর্থনীতিতে পৌঁছাতে পেরেছে শুধুমাত্র মোদীর দৌলতে। এই মোদীকে চীন বা পাকিস্তান বা অন্যান্য দেশ পছন্দ করবে কেন?

ডোকলামে ভারতীয় বাহিনীর শৌর্যে পরাভূত হয়ে চীনের মতো বিশ্বশক্তিকে ভুটান দখল করার বাসনা থেকে বিরত থাকতে হয়েছে! ১৯৯৮ সালের অটলবিহারীর রাজত্বকালে, তৎকালীন প্রতিরক্ষামন্ত্রী জর্জ ফার্নান্ডেজই বলেছিলেন, 'ভারতের এক নম্বর শত্রু হচ্ছে চীন'।

চীনের সদা-বাহার বন্ধু বিশ্ব-সন্ত্রাসবাদের জেহাদি সরবরাহকারী দেশ পাকিস্তানের উপর ভারতীয় বাহিনীর প্রহার প্রকারান্তরে চীনের উপরই সে আঘাত! তা সে সহ্য করবে কেন? তাই 'মাসুদ আজাহার'কে রাষ্ট্রসঙ্ঘের বৈঠকে সন্ত্রাসবাদী ঘোষণা করা থেকে বিরত থেকেছে।

২০১৪ সালে মোদীর শপথ অনুষ্ঠানে তিব্বতের বিতর্কিত রাষ্ট্রপ্রধান লোবসাং সাঙ্গেকে নিমন্ত্রণ করা চীন সহ্য করে কী করে? তাই তো চীনের এত গোঁসা!

'বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ' যা বালুচিস্তান পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের মধ্যে দিয়ে রাস্তা তৈরির পরিকল্পনা, যেটাতে ভবিষ্যতে ভারতের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার



যথেষ্ট সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, তাতে মোদীর না-মঞ্জুরিই যে চীন এবং পাকিস্তানের গোঁসার কারণ!

অরুণাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড আর শিলিগুলির 'চিকেন নেকে'--- চীনের আগ্রাসনের অনেক প্রমাণ আছে। তার থেকে বাঁচার জন্য মোদী অরুণাচল, উত্তরাখণ্ডের 'চার ধাম' এবং সিকিমের পেকং-এ দেশের শততম বিমানবন্দর তৈরি করে ভারতের নিরাপত্তা বলয়ের পরিধি অনেকগুণ বাড়িয়ে দিয়ে চীনের ক্রোধের কারণ হয়েছেন।

ভারতের সঙ্গে চীনের 'ট্রেড ডেফিসিট' ৫০ বিলিয়নেরও বেশি। অর্থাৎ চীন তার বিশাল পণ্য সামগ্রী ভারতের বাজারে বিক্রি করে মুনাফা লুটে কিন্তু চীনাবাজারে ভারতের মাল বিক্রি হয় পরিমাণে অনেক কম। এটা মোদীসরকার বন্ধ করার চেষ্টা করছে। তাই মোদীর উপর চীনের আক্রোশ।

ভারতের 'ব্রাহ্মোস মিসাইল' এক অসাধারণ মারণাস্ত্র। দক্ষিণ চীনসাগর সংলগ্ন সমস্ত দেশ ভারত থেকে ব্রাহ্মোস কিনতে চাইছে চীনের আক্রমণকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে। তাতে ভারতের বিরুদ্ধে চীনের আক্রোশ বাড়বে বইকি!

আমেরিকা, ফ্রান্স ব্রিটেন— নানা বিষয়ে চীনের আগ্রাসী নীতিকে প্রতিহত করার জন্য ভারতের উপর নির্ভর করছে। মোদীর জন্য চীনের এশিয়া মহাদেশে একছত্র প্রতিপত্তি অনেক কমে গেছে।

এহেন বিরোধী নীতির জন্য মোদীকে ভারতের কমিউনিস্টরা কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে জেহাদি তত্ত্বের (সন্দীপ নওলকা, রোনা উইলসন, সুধা ভরদ্বাজ) সহায়তায় মোদীকে শেষ করে দিতে চাইছে।

এবার আসি পাকিস্তানের কথায়।

কালাতদের হাত থেকে অবৈধভাবে ১৯৪৭ সালে ছিনিয়ে নেওয়া বালুচিস্তানের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের ভূমিকা নাকি অবিসংবাদী। তাই শুধু 'অধিকৃত কাশ্মীর' নয় গোটা ভারতকে 'ব্রেকিং ইন্ডিয়া ফোর্সের'

সাহায্যে ১৬টি টুকরোই ভেঙে ফেলে ১৯৭১ সালের বাংলাদেশ স্বাধীন করার প্রতিশোধ নেবে পাকিস্তান!

বিচ্ছিন্নতাবাদী কাশ্মীরি নেতাদের ধরপাকড়, পাথরবাজদের দমন, উরি ও পুলওমার প্রতিশোধ নেবার জন্য দায়ী মোদী। সুতরাং তাকে হটাতেই হবে যেন তেন প্রকারে। পাকিস্তানি মিডিয়া ২৪ ঘণ্টা দিল্লির 'লুটিয়েন' মিডিয়ার সঙ্গে হাত মিলিয়ে মোদীর বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে কীভাবে মোদীর জাতীয়তাবাদী চরিত্রকে কালিমালিপ্ত করা যায়। তার জন্য কেমব্রিজ এনালিটিকা এবং শ্যাম পিত্রোদার নেতৃত্বে শিকাগোয় গুপ্তভাবে আইএসআই-এর সাহায্যে পৃথিবীর তাবড় সাংবাদিকদের সহায়তায় কংগ্রেস এবং কমিউনিস্টরা নিরন্তর কাজ করে চলেছে। বরখা দত্ত, শেখর গুপ্তা, প্রণয় জেমস রয়, সাগরিকা ও দিলীপ সরদেশাইয়ের মতো হিন্দুনামধারী কট্টর হিন্দুবিরোধী ভারত-বিভাজনকারীদের স্লোগান, 'মোদী হটাও ও অবাধে লুট করো'। বিদেশি আক্রান্তরা সহস্র বছর পরও শোষণ আর শাসন অব্যাহত রেখেছে এইসব দেশদ্রোহীদের সহায়তায়।

পাকিস্তান ৫০ বছরের জন্য ভারতের সীমান্ত রক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সিয়াচিন, গিলগিট ও বালুচিস্তানকে লিজ দিয়েছে চীনকে। তাই পাকিস্তানের জন্মমুহূর্ত থেকে হিন্দুপ্রধান ভারতের সঙ্গে যে শত্রুতার সৃষ্টি হয়েছে, তা কোনোদিন মিটবে বলে আশা করা যায় না। কারণ ইসলাম, জিহাদ, দার-উল-হার্ব এবং কাফেরের তত্ত্বের সঙ্গে যার পরিচয় হয়েছে, তার কাছে মুসলমানদের সঙ্গে বন্ধুত্ব মানে স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করে নেওয়া।

এবার আসি আমেরিকার কথায়।

আমেরিকার চাই মোদীকে। কেন? তার উত্তর হচ্ছে চীনের এশিয়ায় একছত্র অধিকার কায়েম রাখা, আমেরিকার স্বার্থের পরিপন্থী। দক্ষিণ চীনসাগরে চীনের আধিপত্য, তাইওয়ান, হংকং, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, অস্ট্রেলিয়া আর জাপানের সঙ্গে বাণিজ্যের ভাগীদারিতে চীনের দাদাগিরি আমেরিকা সহ্য করবে কেন? তাই ভারতের বন্ধুত্ব রেখে চীনের সঙ্গে লড়াইয়ে নেমেছেন ট্র্যাম্প।

আমেরিকা ইরানের উপর আর্থিক অবরোধের সৃষ্টি করেছে। মোদী কিন্তু ডলারের পরিবর্তে ভারতীয় মুদ্রায় ইরানের কাঁচা তেল কেনার ব্যবস্থা করে ফেলেছে। আমেরিকা রুষ্ট হলেও মেনে নিয়েছে কারণ মোদী ৪/৫ বিলিয়ন ডলারের আমেরিকান অ্যাসল্ট রাইফেল, চিনুক, আপাচে, হাউইৎজার আর ড্রোন ইত্যাদি মারণাস্ত্র কিনেছে দেশের প্রতিরক্ষার খাতিরে।

আফগানিস্তানে আমেরিকার বহু সৈন্য রয়েছে ১৯৯০ সাল থেকে। পাকিস্তানের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্ক ভালো নয় সেই ৯/১১-এর পর থেকেই। তাছাড়া অ্যাবাটাবাদে পাকিস্তানি সেনার ওসামা বিন লাদেনকে নিরাপত্তা দেবার কারণে পেন্টাগনের কুদৃষ্টিতে আছে পাকিস্তান। তাই চীন ও পাকিস্তানকে শায়েস্তা করা, আফগানিস্তানে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের স্থাপনা এবং তালিবানি শাসনের অবসানে ভারতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই ট্রাম্পের প্রয়োজন মোদীকে।

ট্রাম্পের যেমন কনসার্ভেটিভ, কমিউনিস্ট ও নিউ ইয়র্কের সংবাদ সংস্থাগুলি সঙ্গে বিরোধ ঠিক তেমনি দিল্লিতে কংগ্রেস ও কমিউনিস্টদের পদলেহী 'লুটিয়েন' মিডিয়ার দেশদ্রোহীরা মোদী বিরোধী কাজকর্ম সংবিধানের আড়াল থেকে ও বাক-স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে নিরন্তর চালিয়ে যাচ্ছে।

এবার আসি রাশিয়ার কথায়।

রাশিয়া ভারতের অভিন্ন বন্ধু সেই নেহরুর সময় থেকেই। রাশিয়া চীনের বিরুদ্ধে যেতে চায় না, কারণ চীন আমেরিকাকে কাবু রাখতে সক্ষম।

ট্রাম্পের প্রতিপক্ষ পুতিনের সঙ্গে সখ্য রেখে ৫.৪ বিলিয়ন ডলারে এস-৪০০ নামক আন্টিমিসাইল ঢাল কিনেছে রাশিয়া থেকে। তাছাড়াও আছে সুখোই, মিগ, চক্র সাবমেরিন, ক্রিমোভ ফ্রিগেট আর কারমোড হেলিকপ্টার। রাশিয়ার কাছ থেকে মোদী তাঁর অদ্বিতীয় কূটনীতির চালে শুধু অস্ত্র কেনায় নয় তাঁর টেকনোলজি ট্রান্সফারের চুক্তিও করতে পেরেছে। প্রতিরক্ষামন্ত্রীর নেতৃত্বে এখন থেকে ভারতেই এইসব অস্ত্রের কারখানা খোলা হবে যাতে স্বদেশের প্রযুক্তিতে আরও উন্নতমানের অস্ত্র তৈরি হয়। ভারত স্বাবলম্বী হয়ে দেশের বেরোজগারিও দূর করতে পারবে।

মোদীর মতই পুতিনও স্বদেশপ্রেমে উদ্দীপ্ত জনপ্রিয় রাজনেতা। একই বয়সি দুই নেতার সখ্য সারাবিশ্ব জানে। পুতিনের মতো দুঁদে বিশ্বনেতা মোদীর মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন এমন একজন চাণক্যকে যিনি দ্বৈতযুদ্ধে উদ্যত ইরান ও আমেরিকা, ইজরায়েল ও প্যালেস্টাইন, রাশিয়া ও আমেরিকা— সবার সঙ্গেই সুষম সামঞ্জস্যের সঙ্গে মধুর সম্পর্ক রেখে চলতে পারদর্শী।

এবার আসি ইউরোপীয়ান দেশগুলির সঙ্গে মোদীর সম্পর্কের কথায়!

ব্রিটেনের থেরেসা মের লেবার পার্টির সদস্যরাও ভোটব্যাঙ্ক পলিটিক্সের খেলায় মত্ত হয়েছেন। কে জানে লন্ডনের মেয়র সাদিক খানের মতো, পাকিস্তানি বংশজ স্বরাষ্ট্রসচিব, সাজিদ জাভেদ একদিন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী হয়ে বসবেন কিনা! কেননা বর্তমানে ব্রিটেনের ১৬টি শহরের মেয়র মুসলমান। তারা কি মোদীকে পুনরায় প্রধানমন্ত্রীর পদে চাইবে নাকি পাকিস্তান-প্রেমী রাহুলের কংগ্রেসকে ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে জিততে সাহায্য করবে?

ফ্রান্সের পূর্ববর্তী রাষ্ট্রপ্রধান ফ্রাশোয়া ওল্যাদেঁর সঙ্গে ২০১৫-তেই মোদীর দুইটি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি হয়। একটি আন্তর্জাতিক সৌরবিদ্যুৎ প্রযুক্তির সমঝোতা আর দ্বিতীয়টি ৫৯০০০ কোটির রাফাল যুদ্ধবিমান কেনার চুক্তি। ফ্রান্স ব্রিটেনের চিরশত্রু। যেখানেই উপনিবেশ ছিল সেখানেই দুই যুযুধানের আবির্ভাব হতো। বর্তমানে রাষ্ট্রপ্রধান এমানুয়েল ম্যাক্রঁর সাথে মোদীর সম্পর্ক মধুর।

তাছাড়া ভারত মহাসাগরে চীনের আধিপত্য এবং বাণিজ্যের উপর একচেটিয়া প্রভুত্ব, সমস্ত পাশ্চাত্য দেশগুলির স্বার্থের পরিপন্থী। তাই এশিয়ায় চীনকে প্রতিহত করতে পারে এমন শক্তি কেবলমাত্র মোদীর মধ্যেই বিদ্যমান। সেজন্য নরওয়ে, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড ছাড়াও অন্যান্য ছোটোবড়ো দেশ মোদীকেই দ্বিতীয় বারের জন্য নির্বাচিত দেখতে চান। কারণও স্পষ্ট। অনেক চুক্তি এখনও শুরুই হয়নি, সেগুলির পূর্ণায়ণও জরুরি তাদের দেশীয় স্বার্থে। সেটা সম্ভব হবে কেবলমাত্র মোদীর উপস্থিতিতে। ■

আমি স্বার্থপর, আমি ভোট দেব আমার স্বার্থে

প্রীতীশ তালুকদার

সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনের আসর বেশ জমে উঠেছে। একদিকে বিজেপির নেতৃত্বে এনডিএ, অপর দিকে কংগ্রেসের নেতৃত্বে ইউপিএ জোট, সপা-বসপা জোট, তৃণমূল ইত্যাদি। এক দিকে নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী, অপর দিকে রাহুল গান্ধী, মমতা ব্যানার্জি, অখিলেশ, মায়াবতী, মেহবুবা, ওমর আব্দুল্লা, চন্দ্রবাবুরা। এ দিকে চৌকিদার, অপর দিকে কাকে ভোট দিতে হবে কেউ জানে না। কাকে ভোট দেব? আমি কিন্তু স্বার্থপর। যেখানে আমার স্বার্থ, সেখানে আমার ভোট।

পূর্বের কংগ্রেস সরকারের টানা দশ বছর যেমন পুতুল নাচ আর কেলেঙ্কারির রংমশাল ছড়িয়ে গেছে, তেমন মোদীজীর এই পাঁচ বছর বেশ রংদার আর দমদার হয়ে জমে উঠেছে। নোটবন্দি, জিএসটি, রাফাল, সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, এখন আবার মহাকাশ প্রতিরক্ষা। বিরোধীরা হালে পানির অভাব অনেক আগেই টের পেয়েছে। তাই আয় ভাই এক সঙ্গে লড়ি করে এখনো কামড়া-কামড়িতেই পাগল। মোদীর পাঁচ বছরে চুরি নাই, কেলেঙ্কারি নাই, তার উপর মোদী ছাপ্পান্ন ইঞ্চি পার করে বাষট্টি ইঞ্চি ছাতি দেখিয়ে দিল দু-দুবার পাকিস্তানে ঢুকে জঙ্গি খতম করে। সারা পৃথিবী মোদীর পাশে দাঁড়িয়ে গেল! ভারতের মতো দেশের প্রধানমন্ত্রী এত ক্ষমতা ধরতে পারে তা তো এত বছর দেশ শাসন করেও কংগ্রেস ও তাদের চামচারা বুঝতে পারেনি! দশ বছর ধরে ঝুলিয়ে রাখা রাফাল পাঁচ বছরে কামাল করতে হাজির হব হব। অর্থনীতিতে এক লাফে বিশ্বে অষ্টম স্থান থেকে পঞ্চমে, রকেট ছুড়ে স্যাটালাইট ভেঙে মহাকাশ প্রতিরক্ষায় বিশ্বের চতুর্থ। হায় হায়! স্বাধীনতার দিন থেকে শুরু করে চৌদ্দ পুরুষ ধরে হাজার গরিবি হটাও স্লোগান দেবার পরও এমন দেশ বানাল কংগ্রেস যে মোদীজীকে এসে ন' কোটি শৌচাগার বানিয়ে দিতে হলো বাড়ি বাড়ি, বিদ্যুৎ পৌঁছে দিতে হলো গ্রামে গ্রামে, মায়েদের দুর্দশা দূর করতে রান্নার গ্যাস দিতে হলো, এমনকী ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টও করে দিতে হলো।

এসব অবশ্য দেশ-দশের বড়ো বড়ো কথা। আমি তো স্বার্থপর, আমার এসব নিয়ে কী কাজ? তাছাড়া, আদার ব্যাপারির জাহাজের খোঁজ নিয়েই বা কী লাভ? সঙ্গত প্রশ্ন। হ্যাঁ, আমি স্বার্থপর। আমার পেট, আমার বৌ-ছেলে-মেয়ে সহ গোটা সংসারের পেট আমাকেই দিন-রাত পরিশ্রম করে ভরাতে হয়। খাওয়া-পরা, পড়াশোনা, মাথা গোঁজা, রোগে ওষুধ আমাকেই জোগাতে হয়, কেউ করে দেয়

দেশকাল

না। আমি নিজের মতো সুখে শান্তিতে থাকতে চাই ব্যাস্। তবে আমি ও আমরা তো এই দেশেই বাস করি তাই ভোটের বাজারে দেশের হাল-চালটা একটু দেখে নিই।

কিছুদিন আগেই এক আন্তর্জাতিক রিপোর্ট উঠে এসে বেশ আলোড়ন ফেলেছে পৃথিবীতে। ২০১৭ সালে মাত্র এক বছরে ইসলামিক জঙ্গিরা চুরাশি হাজার নিরীহ মানুষ খুন করেছে ইরাক, সিরিয়া, সোমালিয়া, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, বাংলাদেশ এবং এই

> "আমি সাধারণ মানুষ, ভোট আমার অস্ত্র। সেই অস্ত্রবলে আমি আমার সন্তানের জন্য নিরাপদ ভারত সৃষ্টি করে যাব। আমি তাঁকেই ভোট দেব যার ভয়ে আমি ভীত হব না, বরং হবে ওই দানবেরা। আমি তাঁকেই ভোট দেব যে আমাদের অধিকার নিরাপদ রাখবে।"

ভারত-সহ পৃথিবীর নানা দেশে। ওই নিরীহ মানুষগুলো কিন্তু আপনার আমার মতোই নিরীহ ছা-পোষা স্বার্থপর, তবু নিজের মতো সপরিবারে সুখে শান্তিতে আনন্দে বাঁচতে পারল না। এই ভারতে, আজ থেকে প্রায় ত্রিশ বছর আগে কাশ্মীরের হিন্দু পণ্ডিতদের উপর শুরু হলো ওই জঙ্গি ও বিচ্ছিন্নতাবাদীদের আক্রমণ। বাড়ি-ঘর পুড়িয়ে দেওয়া হলো, ধর্ষণ করা হলো, হত্যা করা হলো কম করে পাঁচশো নিরীহকে। বাকিরা সব ছেড়ে আজও জম্মু ও দিল্লিতে ছন্নছাড়া শরণার্থী। তৎকালীন কংগ্রেস সরকার নীরব দর্শক হয়ে থাকল, থেকেই গেল আর সাহস পেয়ে জঙ্গি কালচার শুরু হয়ে গেল ভারতে।

মাত্র ১০ বছর আগের ঘটনা; তারিখটা ২৬ নভেম্বর ২০০৮। দিল্লির মসনদে তখনও কংগ্রেস। ড. মনমোহন সিংহ প্রধানমন্ত্রী। সোনিয়া গান্ধী তখন দোর্দণ্ড প্রতাপ কংগ্রেস সভাপতি। পর্দার আড়ালে তিনিই সুপ্রিম প্রধানমন্ত্রী হয়ে দেশ চালিয়েছেন— সে অভিযোগ তখন বেশ শক্তিশালী। মুম্বইয়ে ঘটল ভয়ানক জঙ্গি হামলা। দশজন পাকিস্তানি লস্কর জঙ্গি সমুদ্র পথে ভারতে ঢুকে বিখ্যাত তাজ হোটেল, ওবেরয় হোটেল, হাসপাতাল ও শিবাজী টার্মিনার্স জংশন স্টেশনে হত্যার তাণ্ডব শুরু করল। চার দিন ধরে চলল নারকীয় হত্যাকাণ্ড আর আতঙ্ক। আমার আপনার মতো ১৭৪ জন সাধারণ নিরীহ নারী পুরুষ শিশু যারা নিত্য কাজে ব্যস্ত ছিল— তারা খুন হলো, জখম হলো তিন শতাধিক।

সুখে শান্তিতে নিজের মতো থাকতে চেয়েছিল ২০০৬ সালে মুম্বই সিরিয়াল বোমা বিস্ফোরণে যারা মারা গেছে, তারাও। উরি, পাঠানকোট ইত্যাদি জঙ্গি হামলায় যে সেনারা মারা যাচ্ছে প্রতিনিয়ত তারা তো সুখে শান্তিতে থাকতে চাওয়া আমাদের মতো মানুষেরই ঘরের ছেলে। স্ত্রী-সন্তান ও বাবা-মাকে নিয়ে একটা সুখের সংসার গড়তেই তো চেয়েছিল তারা। কেন তারা অকালে আতর্কিত আঘাতে নিষ্প্রাণ ছিন্ন-ভিন্ন লাশ হয়ে আপনজনের ঘরে ফিরছে? আজ সারা ভারত সন্ত্রাসীদের আখড়া, বারুদের কারখানা আর গুদামে ছেয়ে গেছে।

যে পথ ধরে আপনার একরত্তি বাচ্চাটা স্কুল বাসে বা মায়ের হাত ধরে বাড়ি ফিরছে আগামী কালকের জঙ্গি আঘাত সেখানে ঘটবে না তা কি আপনি বলতে পারেন? এগুলো উদাহরণ, ঘটনা অজস্র।

গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে ক'জন নিজের ভোট দিতে পেরেছেন? বোমা, গুলি, অস্ত্রের তাণ্ডব, রাস্তা রক্তে লাল; প্রায় একশো আমার মতোই তাজা মানুষ ভোটের বলি হলো। সঙ্গে নারীর বস্ত্রহরণ, কেশাকর্ষণ, শ্লীলতাহানি। ত্রিশ শতাংশ আসনে কাউকে প্রতিযোগিতাই করতে দেওয়া হলো না। ভয়ে মুখ খুলতেও পারেননি, পথে-ঘাটে নির্ভয়ে আপন চিন্তা ব্যক্ত করতেও পারেন না। গত রামনবমীতে রামভক্তদের উপর তাণ্ডবের কথা মনে করুন। মনে করুন ধুলাগড়, নলিয়াখালি, বসিরহাট, দেগঙ্গা, ময়ুরেশ্বর, কালিয়াচকের উন্মত্ত ধর্মান্ধদের তাণ্ডব আর এই তৃণমূল সরকার ও প্রশাসনের নির্লিপ্ততা। এই পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতের জেলায় জেলায়, অলিতে গলিতে অজস্র খাগড়াগড়, মেটিয়াবুরুজ, বোমা, বন্দুক, তলোয়ার। তাকিয়ে দেখুন, যে সকল রাজ্য সরকারি কর্মচারী ভোটকর্মী হয়ে বুথে বুথে ভোট নিতে যান তাদের আতঙ্কিত মুখের দিকে। উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম, ভোট কর্মীরা দাবি তুলেছে, কেন্দ্রীয় ফোর্স ছাড়া তারা কোনো বুথে ভোট নিতে যাবেন না। সরকারি কর্মচারীদের এই দাবি, ভয় রাজ্য প্রশাসনের নির্লজ্জ ভ্যাগাবন্ড রূপটা কি তুলে ধরছে না? তা থেকেই তো পরিষ্কার রাজ্যের সাধারণ মানুষের প্রকৃত অবস্থা। আপনি যেখানে বাস করেন সেখানে নিশ্চিন্ত কি?

আমি-আপনি খুব সাধারণ মানুষ। সাধারণ ভাবেই একটু স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে পরিবার আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব নিয়ে আনন্দে থাকতে ভালোবাসি। কিন্তু দেশের রাজনৈতিক শক্তি, দেশের সরকার যদি আমাদের শত্রু হয়ে ওঠে? তাকিয়ে দেখুন একদা ভারতের অঙ্গ বর্তমানে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের দিকে, যেখানে সমাজ, রাজনীতি, সরকার, প্রশাসন সব সে দেশের হিন্দুর মহাশত্রু। হিন্দু সেখান কাফের, মালাউনের বাচ্চা। প্রতিদিন প্রতিনিয়ত সেখানে চলছে চরম অত্যাচার। পিটিয়ে, খুন করে দখল করা হচ্ছে হিন্দুর বাড়ি-ঘর, জমি, মন্দির, শ্মশান। হিন্দু ঘরের বৌ, কিশোরী, যুবতীকে ইচ্ছামতো তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করা হচ্ছে, ধর্মান্তর করা হচ্ছে। সমাধান নেই, পাশে দাঁড়ানোর কেউ নাই। তাকিয়ে দেখুন আফগানিস্তান, ইরাক, সিরিয়া, সোমালিয়ার দিকে। জনগণের শত্রু যখন শক্তিশালী হয়ে ওঠে, শাসক হয়ে ওঠে বা শাসকই যখন শত্রু হয়ে ওঠে তখন বুকে-পিঠে গুলি খেয়ে আপনি পড়ে থাকবেন নর্দমায়, হবেন ক্রীতদাস। আপনার শিশুটা অযত্নে খালি পেটে ছড়ানো লাশের মাঝে ধুলোয় কেঁদে কেঁদে নিস্তেজ হয়ে পড়বে। আপনার আদরের মেয়ে বা ভালোবাসার স্ত্রী ধর্মান্ধ সন্ত্রাসীদের পাশবিক খিদে মেটাতে থাকবে আর খোলা হাটে বিক্রি হতে থাকবে। রাষ্ট্র কী, রাষ্ট্রের সুরক্ষাবলয় কী তা আমরা বুঝতে চাই না। তবে সেই রাষ্ট্রীয় সুরক্ষাবলয় দুর্বল হলে, ভেঙে পড়লে, শাসক শয়তানের পৃষ্ঠপোষক হলে এটাই হয় যা চলছে ওই দেশগুলোতে। আপনার ভারতে, আপনার বাঙ্গলায় কী ওদের অস্তিত্ব অনুভব করছেন না? ওদের দেখছেন না? আগত ভবিষ্যৎকে অনুভব করছেন না?

আশার আলো কি দেখা যাচ্ছে? মুম্বই হামলায় প্রতিরক্ষা বাহিনীর সঙ্গে লড়াইয়ে দশ জঙ্গির মধ্যে ন' জনেরই মৃত্যু হয়েছিল। একজন জীবন্ত ধরা পড়েছিল। আজমল কাসব। সমস্ত তথ্য-প্রমাণ সামনেই ছিল। জীবন্ত সাক্ষী ছিল ওই কাসব। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কী করতে পেরেছিল বা করেছিল তৎকালীন কংগ্রেস সরকার? মোটা মোটা লেকচার দিয়েছিল, নিন্দা করেছিল। কী যায় আসে তাতে ওদের? ওরা তো ভারতে খুনের সন্ত্রাস চালিয়ে বুক ঠুকে তা ঘোষণা করে আতর মেখে, পান মুখে দিয়ে পাকিস্তানের পথে হাওয়া খেতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল নিশ্চিন্তে। জানত, মুখে বলতও, ভারতে হিজরেরা দেশ চালায়। সেই হিজরেদের মাঝ থেকে মরদ উঠে আসতে পারে তা ভাবতে পারেনি। নরেন্দ্র মোদীই প্রথম প্রধানমন্ত্রী যিনি সন্ত্রাস দমনে সেনাকে ঢেলে সাজাচ্ছেন, হাত খুলে দিয়েছেন। পাকিস্তানে ঢুকে দু' দু-বার জঙ্গি খতম করে বুঝিয়ে দিয়েছেন সময় পাল্টেছে। শুধরে যাও নয়তো একের বদলে দশটা মারব, ঘরে ঢুকে মারব।

ও বাবা! আমাদের ঘরেই তো ওদের দরদি কত! বলে ভারত তেরে টুকরে হোঙ্গে, জঙ্গির মানবাধিকার, মৌলিক অধিকার। তাইতো দেশের নাগরিক মরলে, সেনা মরলে জঙ্গিকে গাল দেয় না, পাকিস্তানকে গাল দেয় না। আবার দেশের সরকার জঙ্গি মারলে তাতে রাগ করে। শুধু কী তাই? টাকা জোগায়, আশ্রয় দেয়, পথ বাতলে দেয়, আইনি সাহায্য করে; ভোট দিলেই হলো। ওদের কাউকে কাউকে আবার সরকারি টাকা, সরকারি গাড়ি, সরকারি দেহরক্ষী দিয়েও রেখেছিল। সেখানেও পেশাই শুরু হয়েছে, আখ পেশাই হবে।

আমি স্বার্থপর, আমি আমারটা বুঝি। আমি সুখ-শান্তিতে থাকব যদি আমার পরিবার নিরাপদ থাকে। সপরিবারে আমি তখনই নিরাপদ থাকব যখন আমার গ্রাম, আমার থানা, আমার জেলা, আমার রাজ্য নিরাপদ থাকবে, গুন্ডা, সন্ত্রাস, তোলাবাজ, দালাল মুক্ত থাকবে। আমার রাজ্য তখন নিরাপদ থাকবে যখন আমার দেশ ভিতর থেকে ও সীমান্ত থেকে সুরক্ষিত থাকবে। আমার দেশ সব দিক থেকে তখন নিরাপদ থাকবে যখন ভারতমায়ের পূজারি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শক্তিশালী শাসকের হাতে দেশের ভার থাকবে। ভারত নিরাপদ তো আমি নিরাপদ। নিশ্চিন্ত, সুখী। আমি স্বার্থপর, তবু আমি আমার স্বার্থে ভোট দেব। যখন আমার মতো আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপর ভালো মানুষেরা অহঙ্কারে নিজেদের ঘরবন্দি করে নেয় তখন শয়তানেরা দলে দলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। শয়তানকে জিতিয়ে শাসক বানিয়ে দেয়। আমরা চার দেওয়ালের ভিতর মোটা মোটা লেকচার ঝেড়ে দায় সারি আর ক্রন্দন করি। কিন্তু আর তা হবে না, আমি ভোট দেব, বিচার বিবেচনা করে আমার স্বার্থে, আমার সন্তানের স্বার্থে ভোট দেব। আমার সন্তানকে আমি লোলুপ হিংস্র দানবে ভরা ভারতে ছেড়ে যেতে পারি না। আমি সাধারণ মানুষ, ভোট আমার অস্ত্র। সেই অস্ত্রবলে আমি আমার সন্তানের জন্য নিরাপদ ভারত সৃষ্টি করে যাব। আমি তাঁকেই ভোট দেব যার ভয়ে আমি ভীত হব না, বরং হবে ওই দানবেরা। আমি তাঁকেই ভোট দেব যে আমাদের অধিকার নিরাপদ রাখবে। আমি তাঁকেই ভোট দেব যার ভয়ে সাধারণ মানুষ মুক ও বধির হবে না, আমার শত্রু, আমাদের দেশের শত্রু ভয়ে কাঁপবে, দেশ ছেড়ে পালাবে। আমি তাঁকেই ভোট দেব যে আমার দেশকে, আমার সমাজকে, আমার পরিবেশকে নিরাপদ করে তুলবে আর সারাবিশ্বে ভারতীয় রূপে আমাকে গর্বিত করবে। ■

আটশো বছরের বিধর্মী শাসনে হিন্দুরা কেমন ছিল

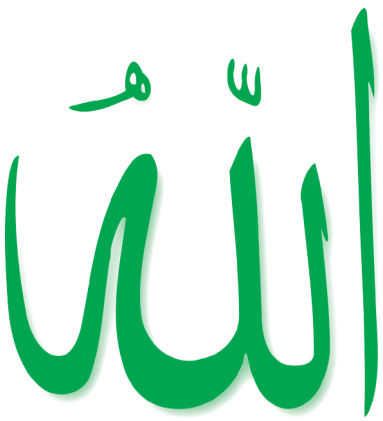
প্রণব দত্ত মজুমদার

জিম্মি, জিজিয়া জিহাদ একটি ধর্মের কুৎসিত ও নির্মম আচার বিচার হিসেবে আমাদের দেশে প্রবেশ করেছিল। জিম্মি ও জিজিয়ার প্রচলন এখন না থাকলেও জিহাদ কিন্তু এখনো নানারকম ছদ্মরূপে তার জাল বিস্তার করে চলেছে।

একটি বিশেষ ধর্মের সঙ্গে এই শব্দগুলি জড়িয়ে আছে— এই ধর্মের প্রবর্তক হজরত মহম্মদ। তিনি ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে মক্কার পৌত্তলিক কোরেশ বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

ইসলামের মূল মন্ত্র হলো— 'লা ইলাহা ইল্লাল্লা, মহম্মদুর রসুলাল্লা' অথাৎ আল্লা ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই, মহম্মদ আল্লার রসুল বা পয়গম্বর। এটা যারা মেনে চলেন তারা হলেন মোমেন বা ইমানদার মুসলমান। মুসলমান ছাড়া অন্য সবাই হয় জিম্মি নয় কাফের।

মুসলমানদের বিশ্বাস অনুযায়ী মহম্মদের যখন ৪০ বছর বয়স তখন মক্কা থেকে কিছু দূরে হেরা পর্বতে সাধনা করবার সময় তিনি আল্লার কৃপা লাভ করেন এবং নবিত্ব প্রাপ্ত হন। আল্লার দূত জেব্রাইল নবির কাছে আসেন স্বর্গীয় গ্রন্থ (আসমানী কেতাব) কোরান নিয়ে যেখানে আল্লার নির্দেশাবলী লিপিবদ্ধ করা আছে। মহম্মদ লেখাপড়া জানতেন না বলে জেব্রাইল কোরান থেকে আল্লার নির্দেশাবলী পড়ে শোনান। এইভাবে পরবর্তী ২৩ বছর ধরে মাঝে মাঝেই জেব্রাইল এসে মহম্মদকে আল্লার বাণী বা নির্দেশাবলী পড়ে শুনিয়ে যেতেন। এগুলোকে বলা হয় আল্লার 'ওহি' বা আল্লার প্রত্যাদেশ। মহম্মদ সেইসব প্রত্যাদেশ তাঁর অনুগামী মোমেনদের মধ্যে প্রচার করতেন। তারা সেগুলি চামড়া, পাতা ইত্যাদিতে লিখে রাখত বা স্মৃতিতে ধরে রাখতো। নবি মহম্মদ মারা যাবার পর খলিফা আবু বক্করের সময় এই সমস্ত ওহি লিপিবদ্ধ হয়ে তৈরি হয় কোরান। ইসলাম অনুযায়ী সরাসরি আল্লার বাণী হওয়ায় কোরান



অপরিবর্তনীয়। প্রত্যেক মুসলমানকে আল্লার কোরান ও আল্লার রসুলকে বিশ্বাস করতেই হবে। যারা আল্লার কোরান ও আল্লার রসুল মহম্মদকে বিশ্বাস করে না তারা হলো কাফের। আরবি শব্দ কুফর থেকে কাফের। 'কুফর' মানে অবিশ্বাস করা বা বিরোধিতা করা।

ইসলামি তত্ত্ব অনুযায়ী অমুসলমানদের দু' ভাবে ভাগ করা হয়েছে। ;জিম্মি আর কাফের। যাদের নিজস্ব পয়গম্বর এবং আসমানি কেতাব বা স্বর্গ থেকে নেমে আসা ধর্মগ্রন্থ আছে তাহা হলো জিম্মি। যেমন ইহুদিদের পয়গম্বর মুসা বা মজেস এবং তাদের আসমানি কেতাব তৌরাত; আর খ্রিস্টানদের পয়গম্বর যিশু, তাদের আসমানি কেতাব বাইবেল। তাই ইহুদি আর খ্রিস্টানরা হলো 'জিম্মি'। পৌত্তলিক হিন্দুদের না আছে পয়গম্বর না আছে আসমানি কেতাব। তাই তারা হলো 'কাফের'। ইসলামের চোখে জিম্মিরা নিকৃষ্ট আর কাফেররা নিকৃষ্টতম। ইসলামি শাস্ত্র মতে জিম্মিরা জিজিয়া দিয়ে তাও বেঁচে থাকতে পারবে। কিন্তু হিন্দুদের মতো পৌত্তলিক কাফেরদের মাত্র দুটি পথই খোলা আছে— হয় ইসলাম গ্রহণ, না হয় মৃত্যুকে বরণ।

হজরত মহম্মদের নবিত্ব প্রাপ্তির পর থেকে এইরকম সব নিয়মকানুন সংবলিত ওহি (আল্লার প্রত্যাদেশ) জিব্রাইলের মাধ্যমে মহম্মদের কাছে আসতে লাগল; আর তিনি সেইগুলি তাঁর অনুগামী মুসলমানদের মধে প্রচার করতে লাগলেন এবং কঠোর ভাবে তা কার্যকরী করতে লাগলেন। কোরানে লিবিপদ্ধ এই প্রত্যাদেশগুলোকেই কোরানের আয়াত বলা হয়। কোরানের কয়েকটি আয়াত লক্ষ্য করুন— ''হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা আল্লা ও তাঁর রসুলে বিশ্বাস স্থাপন কর এবং তোমাদের ধনসম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লার পথে জিহাদ কর। ইহাই তোমাদের পক্ষে কল্যাণকর। আল্লা তোমাদের সব পাপ ক্ষমা করবেন এবং তোমাদের জান্নাতে দাখিল করবেন। ইহাই মহা সাফল্য (৬১/১১-১২)''। ''কাফেরদের মধ্যে যারা তোমার নিকটবর্তী তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর ওরা তোমাদের কঠোরতা দেখুক (৯/১২৩)''। ''কাফেরদের যেখানে পাবে হত্যা করবে, তাদের জন্য ঘাঁটি গেড়ে ওঁত পেতে থাকবে (৯/৫)''। ''তাদের হত্যা কর, কিংবা তাদের শুলবিদ্ধ কর, অথবা তাদের হস্তসমূহ ও পদসমূহ বিপরীতক্রমে কর্তন কর, অথবা তাদের দেশ থেকে বহিস্কার কর (৫/৩৩)''।

জিহাদ হলো সেই যুদ্ধ যার মাধ্যমে এই পৃথিবীকে জিম্মি ও কাফের মুক্ত করে আল্লার শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে যা মুসলমানদের পবিত্র কর্তব্য এবং যা করলে তারা অবশ্যই জান্নাতে (স্বর্গে) যাবে। দার-উল ইসলাম হলো সেইসব দেশ যেখানে পুরোপুরি ইসলামিক শাসন কায়েম হয়েছে। দার-উল-হার্ব হলো সেইসব দেশ যেখানে ইসলাম কায়েম করার জন্য লড়াই চলছে। 'দার-উল-হার্ব' থেকে 'দার-উল-ইসলাম'-এ পরিণত করার জন্য নিরন্তর জিহাদ চালিয়ে যেতে হবে— এটাই ইসলামের শিক্ষা। জিহাদ যারা করে সেইসব আল্লার সৈনিকদের বলে মুজাহিদ বহুবচনে মুজাহিদিন। জিহাদ করলে মুজাহিদিনদের ইহকালে এবং পরকালে দুতরফেই লাভ। ইহকালে জিম্মি ও কাফেরদের মেরে কেটে ধর্ষণ করে ধ্বংস করলে তাদের নারী-সহ ধনসম্পদ (গণিমতের মাল) উপভোগ করা যাবে আর মৃত্যুর পরে জান্নাতে (স্বর্গে) থাকবে অঢেল সুখ ভোগের ব্যবস্থা, এমনকী প্রত্যেকে

৭০ জন করে সুন্দরী হুরি পাবে; তাদের সঙ্গে অনন্তকাল যৌন-আনন্দ উপভোগ করতে পারবে। এমনই সব লোভনীয় ব্যবস্থার কথা বলা আছে ইসলাম শাস্ত্রে।

নবিত্ব প্রাপ্তির পরে ২৩ বছর ধরে আল্লার প্রত্যাদেশ পেয়ে, তা প্রচার করে এবং কঠোর ভাবে পালন করে আরব ভূখণ্ড থেকে ইহুদি, খ্রিস্টান ও অন্যান্য পৌত্তলিক ধর্মসমূহকে পুরোপুরি নির্মূল করে ইসলামকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে নবি মহম্মদ ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে ৬৩ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুর পরে পরবর্তী খলিফারা ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী পৃথিবীর বিভিন্ন দিকে ইসলামের রাজত্ব কায়েম করার জন্য উদ্যোগী হলেন।

দ্বিতীয় খলিফা নবির শ্বশুর ওমরের শাসনকালে ৬৩৬ সালে ভারত সীমান্তে আক্রমণ শুরু হয়। প্রায় আট দশক ধরে বারংবার উদ্যোগের ফলে অবশেষে ৭১২ সালে মহম্মদ-বিন-কাসিম ভারতের দেবালয় (আজকের করাচি)-তে প্রবেশ করে। হিন্দু মন্দির ধ্বংস করে, হিন্দু পুরুষদের হত্যা করে, হাজার হাজার হিন্দু নারী ও শিশুদের লুণ্ঠন করে নিয়ে যায়। তারপরে ১০০০ সালে গজনির সুলতান মামুদ ভারত আক্রমণ করে। মামুদ ১৭ বার ভারত আক্রমণ করে। শত শত হিন্দু মন্দির ধ্বংস করে, হাজার হাজার হিন্দু পুরুষদের হত্যা করে, হাজার হাজার হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করে মামুদ। সুন্দরী রমণীসহ প্রায় দু' লক্ষ লোককে ক্রীতদাস বানিয়ে গজনিতে নিয়ে যায় এবং গুজরাটের সোমনাথ মন্দির পুরোপুরি ধ্বংস করে দিয়েছিল মামুদ।

মহম্মদ-বিন-কাসিম থেকে মামুদ পর্যন্ত মুসলমান আক্রমণকারীরা ভারত আক্রমণ করেছে, হিন্দু মন্দির ভেঙেছে ইসলামের প্রসার ঘটিয়েছে, হিন্দুদের ধনসম্পদ ও নারী লুটে নিয়ে দেশে ফিরে গেছে। ১১৯২ সালে ভারত আক্রমণ করে মহম্মদ ঘোরি। সে হিন্দু রাজা পৃথ্বীরাজ চৌহানকে পরাজিত করে দিল্লি দখল করে ভারতে ইসলামি শাসনের প্রবর্তন করে। তারপর একের পর এক মুসলমান বংশ, যেমন— মামলুক, খিলজি, তুঘলক, লোদি বংশ ভারত শাসন করে ইসলামি কানুনে। ১৫২৬ সালে ভারতে মুঘল শাসনের পত্তন করে বাবর। ১৫২৬ সাল থেকে ১৭০৭ পর্যন্ত চলে মুঘল শাসন। তারা প্রত্যেকেই কোরানের নির্দেশে কাফেরের ধর্ম ধ্বংস করে ভারতে ইসলামের প্রসার ঘটিয়েছে।

মুসলমান শাসকরা ভারতভূমিতে ইসলামের শাসন কায়েম করে কাফের হিন্দুদের ক্ষেত্রে কোরানের নির্দেশে— 'হয় ইসলাম গ্রহণ, না হয় মৃত্যুবরণ' প্রয়োগ করতে গিয়ে দেখল এতে গ্রামের পর গ্রাম উজাড় হয়ে যাচ্ছে। এতে নতুন সঙ্কট তৈরি হলো। হাজার হাজার একর জমিতে চাষের লোকের অভাব দেখা দিল, খাদ্য সঙ্কট, দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। বাদশা, আমির, ওমরাও, নাজির, উজির, কাজি, মনসবদার ইত্যাদি সমাজের উচ্চবর্গ ব্যক্তিদের বিলাসবহুল জীবনের রসদ উৎপন্ন করার জন্য, এঁদের খিদমত করার জন্য প্রচুর লোকের প্রয়োজন, তার অভাব দেখা দিল। মুসলমান শাসকরা যখন দেখল এই বিরাট দেশ টিকিয়ে রাখার জন্য যে পরিমাণ লোক দরকার তত পরিমাণ হিন্দুদের মেরেকেটে মুসলমান করা যাচ্ছে না, তখন তারা মুসলমান মোল্লা-মৌলবিদের শরণাপন্ন হলো। তারা কোরান হাদিস ঘেঁটে ইসলামের বিধান করলেন। ইসলামের মহান টীকাকার হানিফার মত হলো— 'হিন্দুদের উপর জিজিয়া চাপিয়ে দাও'। অর্থাৎ পৌত্তলিক কাফের হিন্দুদের অপৌত্তলিক জিম্মি বলে গণ্য করা যেতে পারে। জিম্মিরা জিজিয়া দিয়ে তাদের জানমান, সম্পত্তি, নারী ইত্যাদি রক্ষা করতে পারে। ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে ভারতের অধিকাংশ মুসলমান শাসক একমাত্র আকবর ছাড়া হিন্দুদের উপর জিজিয়া চাপিয়েছে। আমরা পাঠ্য ইতিহাস বইতে জিজিয়াকরের উল্লেখ মাত্র পেয়েছি। বিশদে কিছু জানতে পারিনি। শুধু মাত্র কর প্রদান করলেই হবে না। জিজিয়া কর দিতে হবে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে। বিনয়ের নমুনা হলো এইরকম— জিজিয়া আদায়কারী মুসলমান কর্মচারী যদি তাদের কাছে রৌপ্যমুদ্রা দাবি করে তবে জিম্মিদের উচিত হবে সসম্মানে বিনয়ের সঙ্গে তাদের স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করা। মুসলমান কর আদায়কারী যদি রেগে গিয়ে তাদের দিকে নোংরা ছুঁড়ে মারে তবে তাদের উচিত হবে হাঁ করে সেই নোংরা গিলে ফেলা।

জিজিয়া শুধুমাত্র বিপুল পরিমাণে কর প্রদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না; এর আওতায় আরও অনেক অমানবিক ও অপমানজনক শর্তাবলীও ছিল যা মান্য করতে হতো। আমাদের পাঠ্য ইতিহাস বইগুলো তা চেপে গেছে। শর্তগুলি ছিল এইরকম— (১) হিন্দুরা কোনো নতুন মন্দির তৈরি করতে পারবে না। (২) মুসলমানরা ভেঙে দিয়েছে এমন কোনো মন্দির তারা মেরামত বা পুনর্নির্মাণ করতে পারবে না। (৩) কোনো মুসলমান পথিক কোনো মন্দিরে রাত্রিবাস করতে চাইলে তা করতে দিতে হবে। (৪) কোনো মুসলমান কোনো হিন্দুর বাড়িতে থাকতে চাইলে, সুস্থ অবস্থায় তিনদিন এবং অসুস্থ অবস্থায় যতদিন ইচ্ছা আদর-যত্নের সঙ্গে থাকতে দিতে হবে। (৫) কোনো হিন্দুকে মুসলমান করা হলে তাতে বাধা দেওয়া যাবে না। (৬) কোনো মুসলমানকে হিন্দু করা হলে যে কোনো মুসলমান সেই কাজে লিপ্ত ব্যক্তিদের হত্যা করতে পারবে। (৭) সব মুসলমানকে সম্মান দেখাতে হবে, কোনো মুসলমানকে যেতে দেখলে নতজানু হয়ে সম্মান দেখাতে হবে। (৮) হিন্দুদের কোনো নিজস্ব আলোচনায় কোনো মুসলমান ইচ্ছে করলে উপস্থিত থাকতে পারবে। (৯) কোনো হিন্দু মুসলমানের মতো পোশাক পরতে পারবে না। (১০) সব সময় তাদের হীন পোশাক পরে থাকতে হবে। (১১) মোহর লাগানো যায় এমন কোনো আংটি তারা পরতে পারবে না। (১২) ঘোড়ার পিঠে গদি লাগিয়ে চড়তে পারবে না। (১৩) তারা কোনো অনুষ্ঠান প্রকাশ্যে করতে পারবে না; আত্মীয়স্বজন মারা গেলেও জোরে কাঁদতে পারবে না। (১৪) তাদের সামাজিক উৎসবাদি মুসলমানদের মধ্যে ছড়াতে পারবে না। (১৫) হিন্দুদের মৃতদেহ মুসলিম কবরখানার কাছে আনতে পারবে না। (১৬) হিন্দুরা মুসলমান এলাকায় বাস করতে পারবে না। (১৭) তারা কোনো অস্ত্র বহন করতে পারবে না। (১৮) তারা কোনো মুসলমানকে ক্রীতদাস রাখতে পারবে না ইত্যাদি। এর থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না প্রায় ৮০০ বছর ধরে মুসলমান শাসনে আমাদের পূর্বপুরুষদের কী অসহনীয় গ্লানিময় নিম্নশ্রেণীর পরাধীনতার জীবনযাপন করতে হয়েছে। ■



ভারতীয় মহিলার নামে প্রথম রেলস্টেশনের নামকরণ

দেবপ্রসাদ মজুমদার

যদি কোনো দেশপ্রেমিক, রাজনীতিবিদ বা সাধারণ শিক্ষিত বঙ্গসন্তানকে প্রশ্ন করা হয় আচ্ছা বলুন তো— ভারতে ভারতীয় মহিলার নামে প্রথম কোন রেলস্টেশনের নামকরণ হয় এবং কবে? তবে বোধকরি খুব কমসংখ্যক লোকই এই প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারবেন। অথচ বাংলা তথা বাঙ্গালিদের কাছে এটা গর্বের। আর গর্বের না হলেও মানুষ অন্তত তাঁকে তাঁর মহত্ত্বকে স্মরণ মনন করবেন, তরুণ প্রজন্ম তাঁর আদর্শে উজ্জীবিত হবে এটাই কাম্য। এই জন্য মহৎ মানুষের নামে রাস্তা, ঘাট, স্থান, রেলস্টেশন, বন্দর, বিমানবন্দর, শহর নগর প্রভৃতির নামকরণ করা হয়ে থাকে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, অতীত-বিস্মৃত বাঙ্গালি তার অতীতকে ক্রমশই হারিয়ে ফেলছে। ব্যক্তিগত হতাশা থেকে কথাগুলো বললেও এর পেছনে একটা কারণ আছে, যার জন্য এই প্রসঙ্গের অবতারণা।

কয়েকদিন পূর্বে আমরা বেশ কয়েকজন প্রয়াগরাজ থেকে কলকাতায় ফিরছিলাম। হঠাৎ আমাদের ট্রেনটি একটি অপেক্ষাকৃত ছোটো স্টেশনে দাঁড়ালো। জানালা দিয়ে দেখলাম স্টেশনটির নাম বেলানগর। এটা আমাদের অনেকের বাড়ির কাছাকাছি হবে বিবেচনা করে এবং হাওড়া গিয়ে বাড়ি আসতে দেরি হবে মনে করে আমরা কয়েকজন ওই স্টেশনে নেমে পড়লাম। জেনেছিলাম ওই স্টেশন সম্বন্ধে আমাদের অনেকের এবং ওই অঞ্চলের বেশিরভাগেরই কেন কার নামে ওই স্টেশনের নামকরণ সে সম্বন্ধে ধারণা অস্পষ্ট ও ক্ষীণ কারো কারো একেবারে নেই ও বলা যায়।

যাইহোক, প্রথমে ওই স্টেশনটির অবস্থিতির অল্প পরিচয় দিয়ে মূল বিষয়ে



বেলা মিত্র

আসছি। হাওড়া-বর্ধমান কর্ডলাইনে হাওড়া থেকে মাত্র বারো কিলোমিটার দূরত্বে শহরতলির এই অপেক্ষাকৃত ছোটো স্টেশনটি অবস্থিত। শহরতলির স্টেশন হওয়ার জন্য নিত্য যথেষ্ট সংখ্যক যাত্রী এই স্টেশন থেকে যাতায়াত করেন। স্টেশনটির নাম বেলানগর। কিন্তু কে এই বেলাদেবী তার খবর কয়জন রাখেন সন্দেহ।

১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে বেলা মিত্রের নামে এই রেলওয়ে স্টেশনটির নামকরণ করা হয় 'বেলানগর' নামে। এটি স্বাধীন ভারতে প্রথম ভারতীয় মহিলার নামে নামকরণ করা কোনো রেলস্টেশন। এখন স্বভাবতই প্রশ্ন, কে ছিলেন এই বেলা মিত্র, যাঁর নামে একটা রেলস্টেশনের নামকরণ হলো? এবার আসা যাক সেই পরিচয়ে। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্রের মা ছিলেন এই বেলাদেবী। না, মন্ত্রীর মা বলে তাঁর এই সম্মান লাভ নয় বা অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্রের কোনো তোষামুদি বা চাটুকারিতার জন্য বা কোনো ব্যক্তিগত প্রত্যাশার জন্যও এই প্রবন্ধ নয়। উদ্দেশ্য বাংলার এক অগ্নিকন্যার কথা স্মরণ মনন করা ও বাঙ্গালি জাতিকে উদ্বুদ্ধ করা যাতে তাঁরা অন্তত তাঁদের পূর্বসূরিদের কথা স্মরণ মনন করে নিজেদের গৌরবান্বিত

করেন।

১৯২০ খ্রিস্টাব্দে অবিভক্ত ২৪ পরগনার কোদালিয়া গ্রামে বেলাদেবীর জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম ছিল সুরেশচন্দ্র বসু। তিনি ছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্রের অগ্রজ। সেই হিসেবে বেলাদেবীর কাকা ছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র। ছোটোবেলা থেকেই পড়াশুনায় অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন বেলাদেবী। তিনি অত্যন্ত সুন্দর ভজন গাইতে পারতেন। এছাড়া সর্ববিষয়ে ছিলেন অসাধারণ। এই মেয়েটির ধ্যান জ্ঞান ছিলেন কাকা সুভাষচন্দ্র। সুভাষচন্দ্রও তাঁর এই ভাইঝিটিকে খুবই পছন্দ করতেন। এই মেয়েটিকে অত্যন্ত পছন্দ করতেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশও। চিত্তরঞ্জন দাশের ঘটকালিতে আইনজীবী যশোহরের হরিদাস মিত্রের সঙ্গে তাঁর বিবাহ সম্পন্ন হয় ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে রামগড়ে অনুষ্ঠিত মুল কংগ্রেস অধিবেশন পরিত্যাগ করে নেতাজী যে আপোশ বিরোধী সম্মেলন আহ্বান করেন, বেলাদেবী তখন তার নারী বাহিনীর কমান্ডার নির্বাচিত হন। নেতাজী পূর্ব এশিয়া থেকে আজাদ হিন্দ বাহিনীর কয়েকটি দলকে বিভিন্ন পথে ভারতে প্রেরণ করেন। এর ফলশ্রুতি হিসাবে মালয়েশিয়ার পেনাং থেকে সাবমেরিনে করে ওড়িশার কোনারক উপকূলে উপস্থিত হন পবিত্রমোহন রায় এবং অমৃক সিংহ গিল। তারপর সড়ক পথে তাঁরা এসে উপস্থিত হন কলকাতায় এবং গোপনে সাক্ষাৎ করেন বেলা মিত্র ও তাঁর স্বামী হরিদাস মিত্রের সঙ্গে। এরপর বেলা ও হরিদাস মিত্রের চেষ্টায় তাঁরা বেহালা অঞ্চলে একটি ভাড়া বাড়িতে থেকে ওই বাড়িকে কেন্দ্র করে আজাদ হিন্দ সরকারের গোপন বেতার তরঙ্গ পাঠাতে থাকেন। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাস থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত তাঁরা কলকাতা থেকে সিঙ্গাপুরে বেতার তরঙ্গে নেতাজীর কাছে সংবাদ আদান-প্রদান এবং আই এনএ-র লোকদের নিরাপদে ভারতভূমিতে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পদার্পণের বিষয়ে খবরাখবর করতে থাকেন।

প্রায় দশ মাস ধরে গোপনে কাজ করবার পর ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দের ২২ অক্টোবর হরিদাস মিত্র ইংরেজ গোয়েন্দাদের হাতে ধরা পড়েন। পরে ৩১ ডিসেম্বর জ্যোতিষচন্দ্র বসু, পবিত্রমোহন ও অমৃক সিংহও ধরা পড়েন। এরপর বিচারের প্রহশন শুরু হয়। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের ২১ জুন দেশদ্রোহিতার অপরাধে হরিদাস, জ্যোতিষচন্দ্র, পবিত্রমোহন এবং অমৃত সিংহ গিলের ফাঁসির আদেশ হয়।

এর পরই নেতাজীর ভ্রাতৃকন্যা বেলাদেবী প্রকাশ্যে নেমে পড়েন। তিনিও যে একজন গোপন সক্রিয় সদস্য এবং তিনি গোপনে আই এনএ-র সদস্যদের টাকা পাঠাতন এসব খবরও চাপা থাকল না। এর পরের ঘটনা আরো রোমহর্ষক। অল্প কিছু দিনের মাত্র ৯ বছরের দাম্পত্য জীবন, কোলে মাত্র তিন মাসের এক শিশু। স্বামী ও তাঁর সহযোগীদের ফাঁসির আদেশ। কীভাবে সকলকে ফাঁসির দড়ি থেকে রক্ষা করা যায়, কে সেকাজ করতে সক্ষম, এই কথা ভাবতে ভাবতে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে ৮ সেপ্টেম্বর বেলাদেবী পুণেতে গান্ধীজীর কাছে উপস্থিত হলেন। গান্ধীজী এই ফাঁসির আদেশের কথা জানতেন না।

নেতাজী ও তাঁদের পরিবারের সঙ্গে গান্ধীজীর দীর্ঘ দিনের সখ্য ও পরিচয় ছিল। গান্ধীজী যখন কলকাতায় শরৎচন্দ্র বসুর বাড়িতে থাকতেন তখন এই বেলাদেবীই তাঁকে দুধ গরম করে এনে খাওয়াতেন নিয়মিত গান্ধীজীর পছন্দের ভজন শোনাতেন। তাই পূর্ব থেকেই বেলাদেবী গান্ধীজীর স্নেহধন্যা ছিলেন। এখন বেলাদেবীকে সামনে দেখে গান্ধীজী স্নেহের আবেশে বললেন— এতদিন পরে আমাকে ভজন শোনাতে এলে বেলা। বেলাদেবী তখন চোখের জল চেপে রেখে সমস্ত কথা গান্ধীজীকে বললেন। শুনে গান্ধীজী বললেন যে তিনি তার স্বামীর প্রাণরক্ষার জন্য সমস্ত প্রকার চেষ্টা করবেন। কিন্তু হরিদাসের প্রাণ রক্ষা হলেও সকলের প্রাণ রক্ষা সম্ভব নয়। তখন বেলাদেবী বললেন— প্রাণ রক্ষা যদি হয় তবে সকলের হোক, অন্যথায় শুধু আমার স্বামীর প্রাণভিক্ষা চাই না। এই কথা বলে তিনি সজল চক্ষে গান্ধীজীর কাছ থেকে বিদায় নিলেন। এর পরের ঘটনাগুলি একদিকে যেমন ঐতিহাসিক তেমনি নাটকীয়।

এই ঘটনার ছ'দিনে ১৪ সেপ্টেম্বর তৎকালের ভারতের বড়লাট ওয়াভেলকে গান্ধীজী একটি চিঠি লেখেন— প্রিয়বন্ধু সম্বোধনে তিনি লিখেছিলেন— 'মানবিকতার তাগিদে এই চিঠি লিখছি। শ্রীসুভাষচন্দ্র বসুর মাত্র ২৪ বছরের তরুণী ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী বেলার স্বামী হরিদাস মিত্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন এমএ। মনে হয় অযৌক্তিক কারণে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন। জাপানের সঙ্গে যুদ্ধশেষে দয়া প্রদর্শন একান্ত বিধেয়। যদি মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয় তবে তা হবে চরমতম রাজনৈতিক ভুল।"

এরপর গান্ধীজী ২৪ সেপ্টেম্বর ও ৯ অক্টোবর দুটি চিঠি লেখেন ভাইসরয়কে। ৯ অক্টোবরের চিঠিতে লেখেন— "মৃত্যুদণ্ড মকুব হবে এই আশায় বন্দির স্বপক্ষে সমস্ত আবেদন ও প্রকাশ্য গণবিক্ষোভ ঠেকিয়ে রেখেছি। এই চিঠির কোনো উত্তর না পেয়ে ১৯ অক্টোবর গান্ধীজী আবার লিখলেন— এটা কি অত্যন্ত বেশি হবে যদি সমস্ত বন্দির মৃত্যুদণ্ড মকুব করার জন্য পুনর্বিবেচনার প্রস্তাব করি।

এরপর ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের ১ নভেম্বর বড়লাট ওয়াভেলের সচিব চিঠি দিয়ে গান্ধীজীর আবেদন অনুসারে চারজনের ফাঁসির আদেশ মকুব করার কথা জানিয়ে দেন। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের ৪ নভেম্বর কলকাতায় বেলাদেবীর চেষ্টা ও দৃঢ়তায় এবং গান্ধীজীর কল্যাণে চারজন যুবকের ফাঁসি রদ হয়ে যায়, যা ব্রিটিশ রাজত্বে এক অভাবনীয় ঘটনা সন্দেহ নেই।

এখানেই শেষ নয়, অন্য কোনো মহিলা হলে নিজ স্বামী-পুত্র নিয়ে সংসার করতেন। কিন্তু বেলাদেবী অন্য ধাতের মেয়ে। সংগ্রাম তাঁর অস্থিমজ্জায়। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে গান্ধীজীর ডাকে দাঙ্গাবিধ্বস্ত নোওয়াখালিতে তিনি জীবন পণ করেন। ইতিহাস তার সাক্ষী। ১৯৪৭ সালে তিনি ঝাঁসীর রানি সেবাদল গঠন করে কাজ শুরু করেন।

এখন এই প্রশ্ন স্বাভাবিক, কেন এই স্টেশনটির নামকরণ তাঁর নামে করা হলো? স্বাধীনতার পর থেকে তিনি উদ্বাস্তুদের মধ্যে সেবাকাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন। বালি ও ডানকুনির মাঝে অভয়নগরে কিছু উদ্বাস্তু পরিবারের পুনর্বসতির জন্য আন্দোলন করে তাদের পুনর্বাসন দান করেন। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে নিদারুণ পরিশ্রমে তাঁর স্বাস্থ্য ভগ্ন হয় এবং ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ৩১ জুলাই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এমন একজন ত্যাগী, বীর অগ্নিকন্যার জন্য শুধুমাত্র একটি স্টেশনের নামকরণ যথার্থ নয় বলে মনে করি। ■

চিঠিপত্র

আসন্ন লোকসভা নির্বাচন কেন্দ্রের, রাজ্যের নয়

বিগত পঞ্চাশ বছর ধরেই পশ্চিমবঙ্গের শাসকরা তাদের অপদার্থতা, অযোগ্যতা, দুর্নীতি সব কিছুর জন্যই দায়ী করছে কেন্দ্র সরকারকে। রিক্ত, বেকার, হতদরিদ্র বাঙ্গালিকে সঞ্জীবিত করার একমাত্র টনিক 'কেন্দ্রের দিল্লি সরকারের বিমাতৃসুলভ আচরণ'। ১৯৭৭ সাল থেকেই ক্রমাগত প্রতিটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারই সমস্ত ব্যর্থতার কারণস্বরূপ ওই একই কাঁদুনি গেয়ে গেছে। আর মানুষও সেই মিথ্যাচার বিশ্বাস করেছে। তাতে সাধারণ মানুষের লাভ কিছু হয়নি। বরং ক্ষতি হয়েছে। কারণ মিথ্যা প্রচার দ্বারা জনগণকে বিভ্রান্ত করে পূর্ববর্তী বামপন্থী এবং বর্তমানে তৃণমূল দিল্লিতে কেন্দ্রবিরোধী সদস্যদের নির্বাচিত করতে পেরেছে। তৃণমূল নেত্রী এবং তৃণমূল এমপিরা তীব্র, তীক্ষ্ণ, তপ্ত, জ্বালাময়ী ভাষণে কেন্দ্রের প্রতি দোষারোপ করতে পারে কিন্তু তাতে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কার্যসিদ্ধি হয় না। বরং উন্নয়নে বাধার সৃষ্টি হয়। ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী বিজেডির নবীন পট্টনায়ক এবং পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী কংগ্রেসের অমরিন্দর সিংহ ভিন্ন দলীয় হয়েও অতি সুচারুরূপে কেন্দ্রের সঙ্গে সুসম্পর্ক রেখে নিজ রাজ্যের উন্নতিতে দৃঢ়সংকল্প। ব্যতিক্রম পশ্চিমবঙ্গ। কেন্দ্রবিরোধী মিথ্যা প্রচারে জনগণ বিশ্বাসস্থাপন করে ভোট দেয় কিন্তু এমপিরা রাজ্যের জনগণের সুরাহা বা রাজ্যের উন্নতিতে স্থিরচিত্ত নয়। দিল্লির ভোটে অবশ্যই রাজ্যের মানুষের দেখা দরকার যে যাকে ভোটটি দিচ্ছি সে কি সরকার গঠন করতে পারবে। নাকি আমার ভোটটি আরেকটি বিরোধী এমপি তৈরি করবে যার কাছ থেকে আবার শুনতে হবে বিগত পঞ্চাশ বছরের সেই একই ঘ্যানঘ্যানানি--- 'কেন্দ্রের বিমাতৃসুলভ আচরণই পশ্চিমবঙ্গের ব্যর্থতার জন্য দায়ী'।

দিল্লির জন্য ভোট দিন সেই প্রার্থীকেই যারা দিল্লিতে মন্ত্রীসভা গঠন করবে। আপনার হয়ে, রাজ্যের হয়ে যে দিল্লিতে কাজ করবে।

—পবিত্র চৌধুরী,
৬৩/২, প্রতাপাদিত্য রোড, কলকাতা-২৬।

পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্রের মৃত্যু

বাম জমানায় পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্রের টুটি টিপে ধরে রেখেছিল তৎকালীন শাসকদল। বৈজ্ঞানিক রিগিং চালু করে তারা ৩৪ বছর ক্ষমতায় টিকেছিল। মানুষ শ্বাসরুদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্তি চেয়ে তৃণমূল দলকে ক্ষমতায় এনেছে। তৃণমূল শ্বাসরুদ্ধ গণতন্ত্রের একেবারে মৃত্যু দণ্ড দিয়েছে। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোটকর্মীদের নানা ভাবে শারীরিক লাঞ্ছনা করা হয়েছে। কোথাও ভোটকর্মীকে কেটে টুকরো করে ফেলে দেওয়া হয়েছে। তাই এবার লোকসভা ভোটের প্রক্কালে ভোটকর্মীরা দাবি তুলেছেন কেন্দ্রীয় বাহিনী না থাকলে তারা ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে যাবেন না। তাদের এই দাবিই প্রমাণ করছে পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্রের মৃত্যু ঘটেছে। মৃত্যু ঘটিয়েছে বর্তমান শাসকদল।

—শ্যামল মাহাতো,
বেলপাহাড়ি, পশ্চিম মেদিনীপুর।

বাকি টাকা যাচ্ছে কোথায়?

কেন্দ্রীয় সরকারের আই সি টি প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের সমস্ত শিক্ষার্থীকে ডিজিটাইজেশন করা হচ্ছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের সমস্ত সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে ডিজিটাল লারনিংয়ের পরিচয় করানো হলো এর মূল উদ্দেশ্য। এই প্রকল্পটি করানো হচ্ছে একটি সংস্থার মাধ্যমে। রাজ্য সরকারের সংস্থা ওয়েবেল ইনফোরমেক্টিস এবং রাজ্য মনোনীত তৃতীয় পক্ষের সংস্থা আইএলএফএস এর দায়িত্ব। এই সংস্থার কাজ হলো স্কুলের কম্পিউটার ক্লাসের শিক্ষকের মাসিক বেতন দেওয়া, ১০টি কম্পিউটার, একটি স্ক্যানার ও প্রিন্টারের রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং বিদ্যুতের বিল দেওয়া। এই প্রকল্পের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দ অর্থ বার্ষিক প্রায় ৩.৫ লক্ষ টাকা প্রতি স্কুলের বরাদ্দ। বিদ্যুতের বিলের জন্য প্রতি স্কুলকে বার্ষিক ৩ হাজার টাকা দেওয়া হয়। রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ১ লক্ষ টাকা লাগতে পারে। বাকি টাকা থাকে শিক্ষকের মাসিক বেতন দেওয়ার জন্য। বাকি টাকা থেকে যদি বেতন দেওয়া হয় তাহলে মাসিক বেতন ১২-১৪ হাজার টাকা হবে। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষকের মাসিক গ্রস বেতন ৪৯৫৬ টাকা। ইএসআই (৮৭ টাকা) ও পিএফ (১৮০ টাকা) কেটে হাতে পান ৪৬৮৯ টাকা। মিন্টো পার্কে বেতন বাড়ানোর দাবি নিয়ে সমস্ত শিক্ষক যখন শান্তিপূর্ণ অবস্থান বিক্ষোভ করেন, তখন প্রকল্প আধিকারিক সাফ জানিয়ে দেন তাঁরা বেতন বাড়াতে পারবেন না। এই পর্যন্ত ঠিক ছিল। কিন্তু তার পরেই হঠাৎ পুলিশ ও কিছু মহিলা শিক্ষকদের উপর হামলা করে। এখন প্রশ্ন হলো, যখন শান্তিপূর্ণভাবে সবকিছু মিটে যাচ্ছিল তখন শিক্ষকদের উপর হামলা করা হলো কেন? আর ওই মহিলারাই বা কারা? আর সরকারি টাকা ঠিকভাবে খরচ না হলে পুলিশের উচিত আন্দোলনকারীদের পাশে থাকা। কিন্তু এর বিপরীত অবস্থানে দাঁড়িয়ে আছে রাজ্য সরকার ও পুলিশ। কেন?

—সুমন সরকার,
ধুলাগড়ী, হাওড়া।

রাশিফলের ওপর ভাগ্যকে ছেড়ে দিতে হবে কেন?

আমি দীর্ঘদিনের স্বস্তিকা পত্রিকার পাঠক। স্বস্তিকার মধ্যেই আমি আমার মনের কথা খুঁজে পাই। এ আমার পারিবারিক পত্রিকা। আমার ছোটো নাতির কাছে নবাঙ্কুর ও চিত্রকথা খুবই প্রিয়। আমার বৌমা স্বস্তিকা খুলেই প্রথমে অঙ্গনা বিভাগটি পড়তে শুরু করে। বাস্তবিকই স্বস্তিকার প্রতিটি পৃষ্ঠা মূল্যবান বিষয়ে সমৃদ্ধ। কিন্তু প্রায় এক বছর থেকে স্বস্তিকায় সাপ্তাহিক রাশিফল যুক্ত হয়েছে। আমার মনে হয়েছে তাতে স্বস্তিকার একটা মূল্যবান পাতা নষ্ট হচ্ছে। কারণ স্বস্তিকার পাঠকরা খুবই মননশীল। আমার মনে হয় তারা রাশিফলের

ওপর ভাগ্যকে ছেড়ে দিয়ে থাকেন না। সমস্ত বাজারি পত্রপত্রিকায় রাশিফল পাওয়া যায়। কেউ যদি রাশিফলের ওপর ভাগ্যকে ছেড়ে দিয়ে থাকেন, তারা সেই সব পত্রপত্রিকা দেখে নিতে পারেন। স্বস্তিকা কর্তৃপক্ষের কাছে আমার নিবেদন, স্বস্তিকার ওই পাতাতে মননশীল পাঠকদের জন্য মূল্যবান লেখা থাকার ব্যবস্থা করুন।

—সুজয় চক্রবর্তী,
কমলপুর, বাঁকুড়া।

ভারতমাতার পরিত্যক্ত সন্তান

আমরা হিন্দু উদ্বাস্তু জনগোষ্ঠী ভারতমাতার পরিত্যক্ত সন্তান অথবা বলা যেতে পারে ত্যাজ্য সন্তান। ভারতের দীর্ঘদিনের রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিপূর্ণতা লাভের অন্তিম লগ্নে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট মধ্য রাতের একটি মাত্র ঘোষণায় কোটি কোটি হিন্দু জনগোষ্ঠী ভারতের মূলভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। অখণ্ড ভারত খণ্ডিত হলো। ফলে সৃষ্টি হলো ভারতের মুসলমান জনগোষ্ঠীর বসবাসের জন্য আলাদা আবাস ভূমি পাকিস্তান যা পুরোপুরি ইসলামি হিসাবে স্বীকৃত এবং ইসলামি শরিয়ত আইন যার সংবিধান। ফলে অন্যান্য ধর্মীয় বিশ্বাসীরা মালাউন বা কাফের হিসাবে পরিচিতি লাভ করলো। একমাত্র মুসলমান এবং মুসলমান শাসকদের করুণায় এবং অনুকম্পায় হিন্দু সহ অন্যান্য জনগোষ্ঠীকে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে বেঁচে থাকতে হলো।

মূল ভারতভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় পাকিস্তানে বসবাসরত হিন্দুদের স্বাধীন ভারতের নাগরিক অধিকার হরণ করা হলো। এদিকে ইসলামি পাকিস্তানে শরিয়ত আইনে খর্ব করা হলো তাদের অধিকার ও স্বাভিমান। হতভাগ্য হিন্দু সমাজ বেওয়ারিস সমাজে পরিণত হলো। তাদের জান, মান ও ধর্মীয় সংস্কার ও সংস্কৃতির উপর খবরদারি পাকিস্তানের অধিকারে পরিণত হলো। এই অধিকার থেকে শুরু হলো পাকিস্তানে বসবাসরত বেওয়ারিস হিন্দু জনজাতির বিষয় সম্পত্তি লুট, বাড়ি ঘরে অগ্নি সংযোগ, মা-বোনেদের ইজ্জত লুণ্ঠন, হত্যা, নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চনা, এমনকী প্রশাসনিক হয়রানি। পাকিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে হিন্দু বিতাড়ন গত ৭০ বছর ধরে অবিরত চলেছে। যার ফলস্বরূপ দুই দেশ হিন্দু শূন্য হতে চলেছে।

একজন ব্যক্তির একটা ঘোষণায় ভারত ভাগ হলো। কোটি কোটি স্বাধীনতাপ্রেমী মানুষ ভারতভূমি থেকে পরিত্যক্ত হলো। এক মুহূর্তে রাষ্ট্রহীন হলাম, ভারতের নাগরিক অধিকার হারালাম। দেশ ভাগের বলি এই সমস্ত পরিত্যক্ত ভারতবাসীর উপর বিনা মেঘে বজ্রপাত ঘটে গেল। দিশেহারা হলাম। আমাদের রাষ্ট্রশক্তি হারিয়ে গেল। আমাদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা রইল না। রাষ্ট্রীয় অভিভাবকহীন হয়ে গেলাম আমরা। আমরা অনাথ, আমরা পরিত্যক্ত, আমরা ভারতভূমির অধিকার থেকে ত্যাজ্যসন্তানের মতো বঞ্চিত। তাই আমরা আমাদের পরম্পরাগত সত্তা, ধর্মীয় বিশ্বাস, সংস্কার ও সংস্কৃতি এবং স্বাভিমান রক্ষার তাগিদে সকল বিষয় সম্পত্তি, ঘর-বাড়ি, ব্যবসা-বাণিজ্যের মায়া ত্যাগ করে চোদ্দ পুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে খণ্ডিত ভারতে আশ্রয় নিলাম। এক অনিশ্চয়তার জীবন শুরু হলো আমাদের। রেল লাইনের ধারে, খাল পাড়ে, ঘিঞ্জি বস্তির উদ্বাস্তু শিবিরে। দেশভাগের ৭০ বছর পরে আজও লক্ষ লক্ষ হতভাগ্য হিন্দু ঝুপড়িতে মানবেতর, মর্যাদাহীন ও পরিচয়হীন জীবন অতিবাহিত করছে। এমনকী ভারতের অন্য রাজ্যের পাহাড়ে, জঙ্গলে, মরু প্রান্তরে এবং গভীর বঙ্গোপসাগরের বিচ্ছিন্ন দ্বীপভূমিতে। স্বাভাবিকভাবে ভিন্ন রাজ্যের জনবিন্যাসে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। ফলে প্রতিনিয়ত স্থানীয় অধিবাসীদের হিংসা ও রোষানলের শিকার হতে হচ্ছে আমাদের। আজও আমরা রাষ্ট্রহীন, নাগরিক অধিকারহীন অবস্থায় অনিশ্চয়তার ও আশঙ্কার মধ্যে দিন অতিবাহিত করতে বাধ্য হচ্ছি। অখণ্ড ভারতভূমিতে আমাদের সবকিছু ছিল— ভূমি ছিল, ঘর ছিল, মান-মর্যাদা, স্বাভিমান, অধিকার সবই ছিল। আজ আমরা রাষ্ট্র হারা, সর্বহারা। দেশ নাই যার পোড়া কাপল তার। ফিরিয়ে দাও আমাদের পরম্পরাগত ভারতীয় নাগরিক অধিকার। ভারতমায়ের ত্যাজ্য সন্তানদের অন্যায় কালা-কানুনের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করো। কবে সেদিন আসবে?

—চন্দন রায়,
পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা-১৬।

পাকিস্তানে হিন্দু হয়রানি

সম্প্রতি পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশে দুই হিন্দু নাবালিকাকে অপহরণ করে ধর্ম পরিবর্তনের ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয় ও প্রতিহিংসামূলক কাজের উদাহরণ। তবে পাকিস্তানে সংখ্যালঘু হিন্দু নির্যাতন নতুন কিছু ঘটনা নয়। ১৯৭১ সালে পূর্ববঙ্গের খানসেনাদের দ্বারা হিন্দুদের নির্যাতন, হত্যাও কম ছিল না। বলাৎকারের ঘটনা অন্তহীন। পাকিস্তানে হিন্দুদের অনুশোচনাময় জীবন নিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হয় মৃত্যু ভয়ে। এ ব্যাপারে ২০১৬ সালে সিন্ধু প্রদেশের বিধানসভায় জোর করে ধর্মান্তকরণের বিরুদ্ধে একটি বিল পাশ হয়েছিল। কিন্তু কট্টরপন্থীদের চাপে সেই বিল কার্যকর করা হয়নি।

সংখ্যালঘু হিন্দুরা পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আফগানিস্তানে প্রতিনিয়ত অত্যাচারের শিকার হচ্ছেন। বিভিন্ন উগ্রপন্থী সংগঠন এধরনের ঘটনায় জড়িত। উগ্র হিন্দু বিদ্বেষ এই মানসিকতায় প্ররোচনা দেয়। কিন্তু হিন্দুরা কখনো সেখানে দেশবিরোধী কার্যকলাপে জড়িত হয়নি। বরং মুসলমানেরা পাকিস্তানের মতো দেশে জঙ্গি কার্যকলাপে জড়িত থেকে হিন্দু নর-নারীদের ওপর নানা অত্যাচার করে থাকে। কিন্তু ভুললে চলবে না যে পাকিস্তানে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে হিন্দুরাই নেতৃত্ব দিয়েছিল। আর হিন্দুরা পাকিস্তান ত্যাগ করেনি, বরং হিন্দুদেরই পাকিস্তান ত্যাগ করার জন্য বাধ্য করা হচ্ছে। অর্থাৎ সেই ট্রাডিশন এখনও রয়ে গেছে। তাই হিন্দু নিধনযজ্ঞ, উগ্র হিন্দু বিদ্বেষ ছড়ানো হয় পাকিস্তান জুড়ে। কিন্তু ভারতের জাতীয়তাবাদী সরকার এ ব্যাপারে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ায় সব সমস্যার অনেকটা সুরাহা হবে বলে মনে হয়। হিন্দুদের এই করুণ অবস্থা দেখে সকলেরই সজাগ, সচেতন হওয়ার সময় এসেছে।

—সমীর কুমার দাস,
দ্বারহাট্টা, হরিপাল, হুগলি।



মহিলাদের হাতে সুরক্ষিত সীমান্তের গ্রাম

সুতপা বসাক ভড়

আত্মরক্ষা ও মাতৃভূমি রক্ষায় মহিলাদের সশক্ত পদক্ষেপ আমাদের বিস্ময়ে আপ্লুত করে তোলে। দেশের সীমান্তবর্তী গ্রামে বসবাসকারী এই মহিলারা নিজেদের গ্রামকে সন্ত্রাসবাদীদের নৃশংসতা থেকে মুক্ত করে, সীমাপারের অস্থিরতার মোকাবিলা করে সুস্থ স্বাভাবিক জীবনযাপন করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। জম্মু-কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলার একটি গ্রাম মোহরা কলাল। এখানে একসময় সন্ত্রাসবাদীদের উপদ্রব লেগেই থাকত, অথচ আজ তারা এখানে পা রাখতে ভয় পায়। এই ভয় দেশের সুরক্ষাবাহিনীর চেয়ে গ্রামবাসী গুজ্জর মহিলাদের ভয়। এঁরা রাইফেল হাতে নিয়ে গ্রাম পাহারা দেন। প্রায় ২০ কিলোমিটার এলাকায় ছড়ানো এই গ্রামে গুজ্জর সম্প্রদায়ের লোকজন বসবাস করেন। এটি জম্মু-কাশ্মীরের সব থেকে বড়ো গ্রাম সুরক্ষা সমিতি। সমিতির ১৮০ জন সদস্যের মধ্যে ১০০ জনই মহিলা। এক একটি দলে ১৩ জন সদস্য আছে। যার নেতৃত্ব মহিলাদের হাতে আছে।

২০০১ সালে সন্ত্রাসবাদীরা এই গ্রামের প্রায় ১৮ জন লোককে হত্যা করে। গ্রামের এক সদস্যা জানিয়েছেন যে, তিনি নিজের আত্মীয়-পরিজনকে সন্ত্রাসীদের হাতে মরতে দেখেছেন। মৃতদের মধ্যে বেশিরভাগই বৃদ্ধ এবং শিশু। সন্ত্রাসীরা চেয়েছিল, এখানকার গ্রামবাসীরা ভয় পেয়ে তাদের অধীনে থেকে তাদের সব নির্দেশ পালন করবে এবং রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপে তাদের সাহায্য করবে; কিন্তু তাদের এই অন্যায় শর্ত গ্রামবাসীরা মানতে রাজি হননি। ফলস্বরূপ তাঁরা তাঁদের নিকটজনদের হারিয়েছেন। অন্য এক সদস্যা শাহিদা বলেছেন যে তাঁদের মা-বোনেদের ওপর সন্ত্রাসীদের অত্যাচার সহ্য করতে তাঁরা রাজি নন। সেজন্য গ্রামের মহিলারা নিজেরাই হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছেন।

এই মহিলাদের সাহায্যার্থে পুরুষরাও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। মহিলা রক্ষী বাহিনীদের এলাকা আলাদা-আলাদা করে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। গ্রাম থেকে প্রায় ৬০ কিলোমিটার দূরে নিয়ন্ত্রণ রেখা। শাকিলা জানিয়েছেন, সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রধান অস্ত্র হলো তাঁদের ঐক্য।

নাজিদা বেগম জানিয়েছেন, ভারতীয় সেনা ২০০৫ সালে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে 'সর্প বিনাশ' অভিযান চালিয়ে ছ'মাসের মধ্যে পুঞ্চ জেলার

এই গ্রামটিকে সন্ত্রাসীদের কবল থেকে মুক্ত করেছিল। গ্রামটিকে সন্ত্রাসমুক্ত করার পর সেনাদের সামনে সবথেকে বড়ো মুশকিল ছিল গ্রামের স্থায়ী সুরক্ষার ব্যবস্থা করা এবং অত্যাচারিত গুজ্জর পরিবারদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা। সেজন্য সেনাবাহিনী গ্রামের মহিলাদের অস্ত্র চালানোর প্রশিক্ষণ দেয়। অপারেশন 'সর্প বিনাশে'র আগে গ্রামে বিশেষ কোনো রাস্তা-ঘাট ছিল না এবং প্রশাসন থেকেও বিশেষ সাহায্য এখানে পৌঁছাতো না। সেনাবাহিনী গ্রামবাসীদের সুরক্ষার জন্য অস্থায়ী কিন্তু সশক্ত পরিষেবা বানিয়ে দেয়।

পিরপাঞ্জাল পর্বতশ্রেণীতে অবস্থিত গ্রাম মোহরা কলাল তুষারপাতের জন্য নভেম্বর থেকে এপিল মাস পর্যন্ত রাজ্যের অন্য এলাকা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এই সময় এখানে আটফুট পর্যন্ত বরফ পরে। গুজ্জর সম্প্রদায়ের পুরুষেরা গবাদি পশু নিয়ে পাহাড় থেকে নীচে নেমে আসে। এই দীর্ঘসময় গ্রামের সুরক্ষার দায়িত্ব থাকে মহিলা সদস্যদের ওপর। শাকিলা বেগম জানিয়েছেন যে, ভারতীয় সেনাবহিনীর পক্ষ থেকে তাঁদের পূর্ণ সহযোগিতা মেলে। এছাড়াও আত্মরক্ষার জন্য তাঁদের রাইফেল দেওয়া হয়েছে। দলের প্রতিটি সদস্য একে-৪৭, একে-৫৬ ছাড়াও অন্যান্য আধুনিক অস্ত্র চালানোতে পারদর্শিনী।

ভারতের সীমান্তবর্তী গ্রামে বসবাসকারী এই মহিলারা খুব সাধারণ। তাঁরা বেশিরভাগই তথাকথিত অশিক্ষিতা বা অল্পশিক্ষিতা। কিন্তু একটা জিনিস তাঁরা নিজেদের জীবন দিয়ে পালন করে চলেছেন, তাহলো মাতৃভূমিকে রক্ষা করা। সন্ত্রাসীদের অত্যাচার সহ্য না করে নিজেদের এবং মাতৃভূমির রক্ষার দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে স্বেচ্ছায় তুলে নিয়েছেন। সেজন্য গ্রামের পুরুষ সদস্যরা যখন পারম্পরিক জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য গ্রাম ছেড়ে নীচে নেমে আসতে বাধ্য হন, তখন গ্রামের ওই অতি সাধারণ মহিলারা ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাহায্য নিয়ে নিজেদের গ্রামের সুরক্ষার ব্যবস্থা নিজেরাই করে থাকেন। কাঁধে বন্দুক নিয়ে যখন এঁরা মাতৃভূমির রক্ষাকর্ত্রীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন, তখন এই সাধারণ মহিলারা অসাধারণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। আমরা যখন তে অতন্দ্রপ্রহরীর মতো জেগে থাকেন শান্তিতে ঘুমিয়ে থাকি, তখন এঁরা দেশের সীমা সুরক্ষিত রাখেন। আমরা তাঁদের ব্যক্তিগত ভাবে চিনি না, তবু আমরা কৃতজ্ঞ তাঁদের কাছে। তাঁদের প্রত্যেককে আমাদের পক্ষ থেকে রইল আন্তরিক অভিনন্দন। ▮



তুলনাহীন তুলসী

অসিতবরণ আইচ

● তুলসী হলো তুলনাহীন। বিনা সারে, বিনা যত্নে মানুষের কল্যাণের জন্য সদা প্রস্তুত তুলসী

● নারায়ণের অধিষ্ঠান তুলসীতে; অর্থাৎ নর + অয়ন = নারায়ণ। অয়ন মানে গতি। নরের গতি বা ভরসা হলো তুলসী।

● বলা হয়েছে যদি তুমি হিন্দু হও তাহলে তোমার বাড়ির পরিচায়ক হবে অন্তত একটি তুলসী গাছ।

● হিন্দু না হলেও, যদি তুমি আত্মকল্যাণ, লোককল্যাণকামী হও তাহলেও তোমার বাড়িতে অবশ্যই তুলসীগাছ থাকতে হবে।

● যদি তুমি তিরিশতলা উঁচু ফ্ল্যাট বাড়িতে থাকো, তাহলেও টবে বা গামলায় একটি তুলসী গাছ অবশ্যই লাগাবে।

● ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করে তুলসীর মর্যাদা না বুঝলে জন্মটাই বৃথা হয়ে যাবে।

● প্রত্যেক বাড়ি 'বৃন্দাবন' হোক, বৃন্দা মানে তুলসী। তুলসীবনকেই বৃন্দাবন বলে।

● তুলসী মূলত দু'রকম। রাম তুলসী, শ্যাম তুলসী। রাম তুলসী হালকা সবুজ। শ্যাম তুলসী কালচে সবুজ। শ্যাম তুলসী বেশি উপকারী।

● নানাভাবে তুলসীপাতা ব্যবহার করা যায়। পাতার রস, পাতা সেদ্ধ করে, কাঁচাপাতা বাড়ির মতো করে, পাতা শুকিয়ে গুঁড়ো করে। চিবিয়ে খেতে নেই।

● তুলসী গাছের কাণ্ড, মঞ্জরী, শিকড় ওষুধ হিসেবে প্রয়োগ করা হয়।

● একটি তুলসী গাছের প্রভাব একশো গজ পর্যন্ত থাকে।

● যিনি প্রতিদিন একটি তুলসীপাতা খান তিনি সুস্থ দীর্ঘজীবন লাভ করেন।

● যে কোনো ঘায়ে তুলসীপাতার রস, বাটা বা শুকনো তুলসীচূর্ণ লাগালে পোকা হবে না এবং শুকিয়ে যাবে।

● তুলসীপাতার রস যতটা মধু তার অর্ধেক যে কোনো সর্দি-কাশির মহৌষধ। ছোটো থেকে বড়ো সকলের জন্যই।

● তুলসীপাতার রস স্ট্রেস কমায়।

● তুলসীপাতা ও আদা একসঙ্গে ফুটিয়ে মিছরি দিয়ে খেলে চা-পানের উত্তম বিকল্প হয়।

● পক্স বা হাম বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে তুলসীর রস খাইয়ে দিলে সব ঠেলে বেরোবে।

● তুলসীপাতা চটকে একটু নুন সহ দাদে লাগালে কাজ হবে। একটু জ্বলবে বটে।

● যেসব মহিলার সাদা স্রাব হয়, তুলসীর কাড়া অর্থাৎ তুলসী ও আদা সেদ্ধ জল করে সারাদিন অল্প অল্প করে খেতে হবে।

● মৌমাছি, বোলতা, ভীমরুল, বিছে বা অন্য কোনো পোকামাকড় কামড়ালে দংশন স্থানে তুলসীপাতার ঘন রস লাগালে যন্ত্রণার উপশম হয় তৎক্ষণাৎ।

● তুলসীপাতার রস চুলে লাগালে খুসকি দূর হয়, চুল শক্ত হয়।

● খুব জোর পায়খানা হচ্ছে, ১০/১৫টা তুলসীপাতা হাফ চা-চামচ জিরার সঙ্গে বেটে জলে গুলে ছেঁকে খেলে দাস্ত বন্ধ হতে পারে।

● নার্ভের রোগে তুলসীপাতার রস মহৌষধ নিত্যদিন সকাল- বিকাল খেতে হবে।

● তুলসীপাতা চটকে ঘ্রাণ নিলে নাকের রোগে আরাম মেলে।

● তুলসীপাতার রস কয়েক ফোঁটা নাকে নিলে রক্ত পড়া বন্ধ হতে পারে।

● শরীরে কোনো জায়গায় কেটে গেলে তুলসীপাতা থেতো করে চেপে ধরলে রক্ত পড়া বন্ধ হবে এবং জ্বালা করবে না।

● তুলসীপাতার রসে হৃদরোগেও উপকার।

● তুলসীপাতার রস কাঁচা হলুদের রসের সঙ্গে মিশিয়ে সকালে খালি পেটে খেলে ব্লাডসুগার কমে।

● তুলসীপাতার রস খেলে কিডনি, লিভার, প্যানক্রিয়াস ভালো থাকে।

● তুলসীপাতার রস রক্ত শুদ্ধ করে।

● তুলসীপাতার রস একটু গরম করে কানে দিলে কানের ব্যথা কমে।

● বারে বারে একটু একটু করে প্রস্রাব হলে তুলসীর রস বা কাড়া খেতে হবে।

● মুখে দুর্গন্ধ হলে মুখের ভিতর তুলসীপাতার মণ্ড বানিয়ে রেখে দিতে হবে। তুলসীপাতা দাঁতে চিবলে দাঁতের ও পেটের ক্ষতি হয়।

● ভাতে দুর্গন্ধ হচ্ছে? চাল ফোটার সময় কিছু তুলসীপাতা দিয়ে দিতে হবে।

● মাছের আঁশটে গন্ধ দূর করার জন্য অনেকে মাছের ঝোলে তুলসী পাতা দেয়।

● শরীরের কোনো জায়গা পুড়ে গেলে পাতার রস মেশানো নারকেল তেল মহৌষধ।

● ঋতুকালে অতিরিক্ত রক্তস্রাবে তুলসীর রস খেতে হবে।

● পানীয় জলে, প্রসাদে, নৈবেদ্যে, মৃতদেহের নাকে-চোখে-কানে তুলসীপাতা দেওয়া হয় যাতে পোকা না লাগে। ব্যাকটেরিয়ামুক্ত করার ক্ষমতা তুলসীর অসাধারণ। ▮

সংকল্পিত ভারত শক্তিশালী ভারত

জাতীয়তাবাদ আমাদের চালিকাশক্তি, অন্ত্যোদয় আমাদের দর্শন আর সুশাসন আমাদের মন্ত্র। বিজেপির নির্বাচনী ইস্তাহার 'সংকল্প পত্র-এর শুরুতেই রয়েছে এই কথাগুলি। সংকল্প পত্রে বিজেপি পঁচাত্তরটি লক্ষ্য স্থির করেছে। প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ক্ষমতায় ফিরলে আগামী পাঁচ বছরে প্রতিটি লক্ষ্য পূরণ করবে দল।

চাষির মুখে হাসি :

ক্ষমতায় ফিরলে পরবর্তী মোদী সরকার প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মান নিধি যোজনা শুরু



করবে। এর ফলে ষাটোত্তীর্ণ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিরা পেনশন পাবেন। কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর জন্য ২৫ লক্ষ কোটি টাকা অতিরিক্ত বিনিয়োগ করা হবে। আসল পরিশোধ করার শর্তে সুদ বর্জিত ঋণ মিলবে কিষান ক্রেডিট কার্ড থেকে। এছাড়া পাওয়া যাবে সুদ-বর্জিত স্বল্পমেয়াদি কৃষি ঋণ। এক লাখ টাকা পর্যন্ত।

জাতীয় নিরাপত্তা :

সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করে তোলার জন্য অত্যাধুনিক সামরিক সরঞ্জাম



কেনার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। অগ্রাধিকার দেওয়া হবে অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র কেনার ওপর যাতে বাহিনীর আঘাত হানার ক্ষমতা বাড়ে। সন্ত্রাসবাদকে রেয়াত করা হবে না। প্রয়োজনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সেনাকে দেওয়া হবে পর্যাপ্ত স্বাধীনতা। ধাপে ধাপে সারা দেশে লাগু হবে এন আর সি।

অর্থনীতি :

মোদী সরকারের লক্ষ্য ২০৩০-এর মধ্যে ভারতকে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম



অর্থনীতিতে পরিণত করা। ২০১৫-র মধ্যে ভারতের অর্থনীতি হবে ৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের আর ২০৩২ সালে ভারতের অর্থনীতি হবে ১০ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের।

অভিন্ন দেওয়ানি বিধি :

সাংবিধানিক লক্ষ্মণরেখা লঙ্ঘন না করে দেশে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি যাতে লাগু করা যায় তার জন্য দল সব ধরনের



প্রয়াস করবে। অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। সংকল্প পত্রে গঙ্গোত্রী থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত— গঙ্গাকে সম্পূর্ণ দূষণমুক্ত করার দায়িত্ব যথাযোগ্য গুরুত্বের সঙ্গে পালন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বিজেপি।

কর্মসংস্থান :

দেশের ২২টি 'চ্যাম্পিয়ন সেক্টর' বেশিরভাগ চাকরি তৈরি করে। ক্ষমতায় ফিরলে বিজেপি এই ক্ষেত্রগুলিকে আরও শক্তিশালী করার মাধ্যমে নতুন চাকরি সৃষ্টি করবে। এছাড়া, নতুন প্রকল্প আনা হবে যার মাধ্যমে বিনা জামিনে ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ পাওয়া যাবে। উত্তরপূর্বাঞ্চলকে শক্তিশালী করার জন্য সেখানকার মধ্যমবর্গীয় বিনিয়োগকারীদের আরও আর্থিক সুবিধা দেওয়া হবে। ২০২৪-এর মধ্যে আরও ২০০টি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় স্থাপন করতে চায় বিজেপি।

নারীর ক্ষমতায়ন :

তিন তালাক এবং নিকাহ হালাল বন্ধ করার জন্য আইন প্রণয়ন করতে বিজেপি



বদ্ধপরিকর। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী এবং আশাদিদিদের স্বাস্থ্যসুরক্ষা সুনিশ্চিত করার জন্য তাদের আয়ুষ্মান ভারত চিকিৎসাবিমা প্রকল্পের আওতায় আনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বিজেপি। সংবিধান সংশোধন করে লোকসভা ও বিধানসভায় মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণ চালু করবে বিজেপি।

সুশাসন :

বিজেপির লক্ষ্য সুশাসনের মাধ্যমে দুর্নীতিমুক্ত ভারত নির্মাণ এবং দ্রুত ও স্বচ্ছ প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ। সরকারি পরিষেবা পাওয়ার অধিকার সুনিশ্চিত করতে সম্ভাব্য সব প্রয়াস করা হবে বলে জানিয়েছে বিজেপি।

বিজেপির নির্বাচনী ইস্তাহার দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের মার্গদর্শন

সনাতন রায়

যে সব সংবাদমাধ্যম বা বিশ্লেষক, এমনকী ভারতীয় অর্থনীতিবিদরাও ভারতীয় জনতা পার্টি ঘোষিত ২০১৯-এর নির্বাচনী ইস্তাহারকে 'আর একটি কল্পতরু হওয়ার বার্তা' বলে ব্যঙ্গ করছেন, তাদের বলব— আরও একবার ভালো করে পড়ুন। আলটপকা মন্তব্য করার আগে তলিয়ে ভাবুন। বুঝতে পারবেন, কল্পতরু নয়, ২০১৯-এ বিজেপির নির্বাচনী ইস্তাহার আসলে ভারতবর্ষের উন্নয়নের দীর্ঘমেয়াদি মার্গদর্শন যা প্রমাণ করে একটি সঠিক রাজনৈতিক দলের সঠিক বিচারধারা। যা প্রমাণ করে, আর শুধু ভরতুকির রাজনীতি নয়— এই ইস্তাহার ভারতবর্ষের উন্নয়নের ইস্তাহার। এবং স্বাধীনতা ইস্তক এমন ইস্তাহার আর কখনও কোনও ভারতীয় রাজনৈতিক দল প্রকাশ করেনি।

কারণ? কারণ এই ইস্তাহার আগামী পাঁচ বছরের জন্য ৭৫টি উন্নয়ন প্রস্তাব এমনভাবে পেশ করেছে যা ভারতবর্ষকে নতুন দিশার পথে পা বাড়াতে সাহায্য করবে। প্রকৃত মানব উন্নয়নের সূচকে বিধৃত হবে ভারতবর্ষ এবং ২০৪৭ সালে স্বাধীনতার শতবর্ষ পূর্তিতে ভারতবাসী হিসেবে আমরা সবাই সমবেত কণ্ঠে গর্বের সঙ্গে বলতে পারব, আমার ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনৈতিক শক্তি এবং বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ উন্নত রাষ্ট্র।

এতদিন ভাবতবর্ষে উন্নয়ন বলতে বোঝানো হতো নির্বাক প্রতিরোধহীন নাগরিক শক্তির হাতে ভরতুকির মোয়া তুলে দিয়ে ভিখারি বানানো। অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতিই ছিল রাজনৈতিক দলগুলির অস্ত্র। কিন্তু এই প্রথম প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী তাঁর প্রথম পাঁচ বছরের প্রশাসনিক অভিজ্ঞতার ঝুলিকে মূলধন করে ঘোষণা করলেন, আর সুযোগের অপব্যবহার নয়। এবার আসুন আমরা সবাই মিলে একটি শক্তিশালী এবং সর্বতোভাবে উন্নত ভারতবর্ষ গড়ে তুলি যেখানে ভারতীয় নাগরিকরা সম্মান পাবেন, উন্নয়নের শরিক হবেন, নিরাপদ জীবন যাপন করবেন এবং সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারবেন। তাঁর দৃপ্ত ঘোষণা : 'Nationalism is our inspiration, good governance is our Mantra.' না, ব্যক্তিবিশেষের অনুপ্রেরণা নয়, এই নতুন ভারতবর্ষ গড়ে উঠবে জাতীয়তাবাদের অনুপ্রেরণায়, ভারতীয়ত্বের গরিমায় এবং এ যাবৎ অদেখা একটি সুশাসনের পরিকাঠামোয়। জাত নয়, পাত নয়। সংকীর্ণ ধর্মান্ধতা নয়। বিজেপির এবারের নির্বাচনী ইস্তাহারের অলঙ্করণ হলো Multi-dimentional এবং Multi Layered।

অর্থাৎ বহুমুখী এবং বহুস্তরীয়। কারণ ভারতবর্ষ গড়ে উঠেছে নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান-এর কৌলিন্যে। সেখানে সবক্ষেত্রে এক মত এক গীত প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। এ কারণেই বিজেপির ইস্তাহার হয়ে উঠেছে রাজনাথ সিংহের ভাষায় vision document এবং জাতীয়তাবাদের প্রতীক যা সন্ত্রাসবাদের ন্যূনতম প্রচেষ্টাকেও সহ্য করবে না।

এই ইস্তাহারের মূল গুরুত্ব কোথায়? উত্তর : এর ভাবনায়। ৭৫টি প্রস্তাব এক একটি মাইলস্টোন। কৃষি, যুবশক্তি ও শিক্ষা, পরিকাঠামো, স্বাস্থ্য, অর্থনীতি, সুস্থ প্রশাসন, সার্বিক উন্নয়ন, নারী উন্নয়ন এবং সংস্কৃতি —এই প্রতিটি বিষয়কেই উন্নয়নের শরিক হিসেবে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যাতে প্রতিটি ভারতবাসী ২০২৫ সালে বলতে পারেন, আমার দেশের অর্থনীতির ভিত্তি পাঁচ মার্কিন ট্রিলিয়ন ডলার। যাতে প্রতিটি ভারতবাসী ২০৩২-এ দাঁড়িয়ে দাবি করতে পারে, আমার দেশের অর্থনৈতিক শক্তির মূল্য দশ মার্কিন ট্রিলিয়ন ডলার এবং আগামী পাঁচ বছরের মধ্যেই ভারতবর্ষের সমস্ত নাগরিক বলতে পারেন, হ্যাঁ মাত্র পাঁচ বছরেই আমার দেশের সরকার শুধুমাত্র পরিকাঠামো ক্ষেত্রেই খরচ করেছে ৯৭ লক্ষ কোটি টাকা আর নগরোন্নয়ন ও গ্রামীণ উন্নয়নে খরচ হয়েছে ২০ লক্ষ কোটি টাকা।

হ্যাঁ, বিরোধীরা যতই চীৎকার করুন না কেন, তাঁরাও স্বীকার করতে



বাধ্য যে একমাত্র বিজেপিই নির্বাচনী ইস্তাহারে সাহস করে বলতে পেরেছে— সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে কোথাও আপোশ নয়। প্রয়োজনে নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে সামগ্রিক ক্ষমতা অর্পণ করা হবে এবং প্রতিরক্ষার স্বার্থে সরঞ্জাম ও অস্ত্র কেনার ক্ষেত্রে বিলম্বিত সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করা হবে। একমাত্র বিজেপির নির্বাচনী ইস্তাহারই বলতে পেরেছে— কাশ্মীরের জনগণের স্বার্থে আর সংবিধানের ৩৭০ ধারা বজায় রাখা যাবে না। কারণ এক দেশের মাটিতে এতবছর ধরে সুবিধা পাবার পর কাশ্মীর আর বিশেষ সুবিধা ভোগ করতে পারে না। এমনকী বাতিল করতে বিল আনা হবে সংবিধানের ৩৫-এ ধারার বিরুদ্ধেও যা আইনে পরিণত হলে সকল ভারতবাসীই কাশ্মীরে জমি, বাড়ি, সম্পত্তি কিনতে পারবেন। একমাত্র বিজেপি ইস্তাহারই বলতে পারে, রামমন্দির হবে। কিন্তু সৌভ্রাতৃত্বের আবহাওয়ায়। প্রতিটি ভারতীয় পরিবারের জন্য গড়ে উঠবে এক নতুন ভারতবর্ষ।

বিজেপির ইস্তাহার দেশের নাগরিকদের ভিখারি বানানোর ইস্তাহার নয়। উন্নয়নের সমস্ত সূচক যাতে সম্মানে পৌঁছতে পারে। মানবসম্পদ উন্নয়নের সমস্ত সূচকগুলি যাতে পরিপুষ্ট হতে পারে সেই সব দিকে সমান ভাবে মানবিক এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিপাতই এই ইস্তাহারের লক্ষ্যণীয় বিষয়।

'সংকল্পিত ভারত সশক্ত ভারত' শীর্ষক এই নির্বাচনী ইস্তাহারের মূল অনুধ্যানগুলির দিকে একঝলক নজর দেওয়া যাক।

কৃষি : ● প্রত্যেক কৃষকের জন্য এক লক্ষ টাকা ঋণ বিনা সুদে ১ থেকে ৫ বছরের জন্য। কিন্তু শর্ত হলো মূল ঋণ শোধ করতে হবে নিয়মিত পাঁচ বছরের মধ্যে। ● কৃষি উন্নয়নে বরাদ্দ হবে ২৫ লক্ষ কোটি টাকা। ● ষাট বছর পেরিয়েছেন এমন সমস্ত ছোটো ও প্রান্তিক চাষি পাবেন মাসিক পেনশন।

জাতীয় সুরক্ষা : ● সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে কোনো আপোশ নয়। ● নিরাপত্তা বাহিনীর হাতেই ক্ষমতা অর্পণ। ● প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম ও অস্ত্র কেনার ক্ষেত্রে বিলম্বিত পদক্ষেপ বর্জন।

নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল : ● সংবিধান ৩৭০ ধারার বিলোপ সাধন। ● সংবিধানের ৩৫-এ ধারার বিলোপ সাধন।

স্বাস্থ্য : ● ১.৫ লক্ষ স্বাস্থ্য ও কল্যাণকেন্দ্র গঠন। ● ৭৫টি নতুন মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন। ● টেলিমেডিসিন ও স্বাস্থ্যপরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন।

অর্থনীতি : ● করস্তর ও কর ছাড়ের পুনর্বিন্যাস। ● ২০৩০ সালের মধ্যে দেশকে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে গড়ে তোলা। ● সহজে ব্যবসা করার পদ্ধতি রূপায়ণ করা। ● ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি। ● খুচরো ব্যবসার ক্ষেত্রে জাতীয় নীতি প্রণয়ন। ● ছোটো শিল্প গঠনের ক্ষেত্রে এক জানালা ব্যবস্থার রূপায়ণ। ● কর কমানো, কর আদায় বৃদ্ধি। ● শিল্পক্ষেত্রে আইনি জটিলতা মুক্তির জন্য কোম্পানির অ্যাক্টের সংশোধন। (বাকি অর্থনৈতিক বিষয়গুলি আগেই আলোচিত হয়েছে।)

দারিদ্র্য দূরীকরণ : ● দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাসকারী জনগণের পরিমাণ একক সংখ্যায় নামিয়ে আনা। ● ২০২২-এর মধ্যে সবার জন্য পাকা বাড়ি গড়ে তোলা।

যুবশক্তি ও শিক্ষা : ● অপারেশন ডিজিটাল বোর্ড প্রকল্পের আওতায় সমস্ত মাধ্যমিক স্তরের স্কুলকে নিয়ে আসা। ● উচ্চশিক্ষায় আর আই এস ই প্রকল্পের মাধ্যমে ১ লক্ষ কোটি টাকা ব্যয় করা। ● ম্যানেজমেন্ট প্রতিষ্ঠানগুলির আসন সংখ্যা বৃদ্ধি। একই সঙ্গে আইনশিক্ষা এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলির আসন সংখ্যা বৃদ্ধি। ● উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে কাজের সুযোগ বৃদ্ধির জন্য ইএনইএস প্রকল্পে আর্থিক সাহায্যদান।

পরিকাঠামো : ● ১০০ শতাংশ পরিবারে বিদ্যুৎ সংযোগ। ● প্রতিটি সাবালক নাগরিকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট। ● প্রতি বাড়িতে টয়লেট। ● প্রতি বাড়িতে নিরাপদ পানীয় জল সরবরাহ। ● জাতীয় সড়কের দ্বিগুণ বৃদ্ধি। ● বিমানবন্দরের সংখ্যা ১৫০ করা। ● বন্দরের ক্যাপাসিটি ২৫০০ মেট্রিকটন করা। ● সমস্ত লাভজনক রেলপথকে ব্রডগেজ লাইনে পরিণত করা। ● সব রেলস্টেশনের ওয়াই ফাই সংযোগ করা। ● ২০২২-এর মধ্যে ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডোর সম্পূর্ণ করা। ● স্মার্ট রেলওয়ে স্টেশন তৈরি করা। ● ২০২২-এর মধ্যে সমস্ত রেলপথে বিদ্যুতায়ন। ● পৃথক জলমন্ত্রক গঠন। ● ১০০ শতাংশ বর্জ্য সংগ্রহ। ● পেট্রোলে আরও ১০ শতাংশ ইথানল মেশানোর চেষ্টা। ● প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের শহরে পাটপলাইনে গ্যাস সরবরাহ। ● সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য হাই স্পিড অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক গঠন। ● সমস্ত গ্রাম ও শহরকে আবর্জনামুক্ত করে ওডিএফ মর্যাদা দেওয়া।

স্বাস্থ্য : ● আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে ১.৫ লক্ষ স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি। ● ৭৫টি নতুন মেডিকেল কলেজ স্থাপন। ● শিশুস্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা তিনগুণ বৃদ্ধি করা। ● ডাক্তার : জনসংখ্যা অনুপাত ১ : ১৪০০ করা। ● পোষণ অভিযান প্রকল্পে অপুষ্টি স্তর কমানো।

সুশাসন : ● প্রতিটি পরিবারের পাঁচ কিলোমিটারের মধ্যে ব্যঙ্ক স্থাপন। ● সমস্ত আদালতে ডিজিটাল টেকনোলজি চালু করা। ● ডিজিটাল টেকনোলজির মাধ্যমে অর্থনৈতিক আদানপ্রদান। ● সরকার কাজকর্মে ডিজিটাল টেকনোলজি প্রয়োগ। ● বায়ু দূষণের প্রকোপ দূর করা। ● মহাকাশে প্রথম ভারতীয় নভেশ্চর প্রেরণ।

নারী উন্নয়ন : ● নারীকর্মীর সংখ্যাবৃদ্ধি। ● তিন তালাক প্রথা রদে আইন প্রণয়ন।

সাংস্কৃতিক উন্নয়ন : ● ২০১১ সালের মধ্যে গঙ্গার দূষণমুক্তি। ● স্বদেশ দর্শন, প্রসাদ এবং হৃদয় প্রকল্পের রূপায়ণ। ● সব সংগ্রহশালায় ডিজিটাল টেকনোলজির মাধ্যমে কাজকর্ম চালু করা।

সামগ্রিক উন্নয়ন : ● সমস্ত শিশুর জন্য রোগ প্রতিষেধক। ● সমস্ত সরকারি ভবনে অবাধ প্রবেশ। ● প্রধানমন্ত্রী শ্রমযোগী মানধন প্রকল্পের আওতায় সমস্ত দোকানদারদের অন্তর্ভুক্তিকরণ। ● অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিকদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা দান। ● সমস্ত জনজাতি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নিয়ে ৬টি সংগ্রহশালা তৈরি করা।

অর্থাৎ নির্বাচনী ইস্তাহারের প্রতিটি বিষয় গভীরভাবে নিরীক্ষণ করলে এটা স্পষ্ট যে, এই ইস্তাহার ভিক্ষাদানের ইস্তাহার নয়। এই ইস্তাহার দেশের নাগরিকদের ভিখারি বানানোর ইস্তাহার নয়। উন্নয়নের সমস্ত সূচক যাতে সম্মানে পৌঁছতে পারে। মানবসম্পদ উন্নয়নের সমস্ত সূচকগুলি যাতে পরিপুষ্ট হতে পারে সেই সব দিতে সমান ভাবে মানবিক এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিপাতই এই ইস্তাহারের লক্ষ্যণীয় বিষয়। এই ইস্তাহার বুঝিয়ে দেয়— পাঁচ বছর নয়। মোদীজীর লক্ষ্য দেশের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন যা ভারতীয়দের জাতীয়তাবাদে যেমন দীক্ষিত করবে তেমনি গর্বিত করবে ভারতবাসী হওয়ার জন্য। তাই ২০১৯-এর বিজেপির নির্বাচনী ইস্তাহার ঐতিহাসিকভাবেই একটি অনন্য অধ্যায়ের সংকল্পপত্র।

তৃণমূলের ইস্তাহারে সিপিএমেরই চেনা সুর



অভিমন্যু গুহ

২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের ইস্তাহার প্রকাশিত হয়েছে। তৃণমূলের আবার ইস্তাহার! অনেকেই মুচকি হাসছেন। বাজারে রসিকতাই চালু হয়েছিল তৃণমূল নেত্রী যদি দেশের বিদেশমন্ত্রী হন, তবে ভারতবর্ষের বিদেশনীতি কী হবে! একথা ঠিক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এসব নীতি-ফিতির ধার ধারেন না। প্রশাসক হিসেবে তাঁর ব্যর্থতা চূড়ান্ত, তার থেকেও বড়ো হলো প্রশাসনের কোনও নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা তিনি করেন না। প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার অনেকেই আড়ালে-আবডালে বলে থাকেন যে প্রশাসক হিসেবে মমতা ভয়ংকর। তৃণমূল এবার যে ইস্তাহার প্রকাশ করেছে তাতে প্রশাসক মমতার সাফল্যের কিছু শুষ্ক পরিসংখ্যান রয়েছে, মূলত তাঁর 'শ্রী' জাতীয় বিভিন্ন প্রকল্পের গুণগান, এগিয়ে বাংলার ঢক্কানিনাদ ইত্যাদি, এগুলির বাস্তবায়নের কী হাল সেটা রাজ্যবাসী ভালোমতনই জানেন।

তার ওপরে রাজ্যে শিল্প নেই। ইস্তাহারে শিল্প-টিল্পের বিস্তর ফিরিস্তি আছে, তবে সেসব যে দৃশ্যমান নয় তা রাজ্যবাসীর চেয়ে ভালো আর কেই বা জানেন। তবে ভাগ্যিস চপ-শিল্প, সিন্ডিকেট-শিল্প, পাড়ার লাফাঙ্গা ক্লাব শিল্প ইত্যাদির সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার কথা উল্লেখ নেই— এও ভাগ্য! তবুও তৃণমূলের ইস্তাহার মোটেই ফেলে দেবার মতো নয়। বরং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কোনও গবেষক ভবিষ্যতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক চরিত্র এবং তাঁর পতনের কারণও যদি বিশ্লেষণ করতে চান তবে এই ইস্তাহারটি তাঁর খুব কাজে লাগবে।

ওসব উন্নয়ন-টুন্নয়ন কিংবা কাজের ফিরিস্তি ভুলে যান, ইস্তাহারটি শুরু হয়েছে তীব্র মোদী বিরোধিতা দিয়ে। ইস্তাহারের প্রারম্ভে বড়ো হরফে লেখা— 'আমরা সবাই দেশের পক্ষে মোদীর পক্ষে নই। মানুষের স্বার্থে বিজেপি হটাও, দেশ বাঁচাও।' এই রাজ্যের সর্বোচ্চ প্রশাসকের জীবনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যবাসীর নাগরিক সুরক্ষা কেড়ে নিয়ে, চিটফান্ডের রমরমায় প্রত্যক্ষ মদত দিয়ে, রাজ্যের বিভিন্ন নির্বাচনে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার বিপন্ন করে কীভাবে মানুষের স্বার্থ রক্ষা করেছেন— তা দেশবাসী প্রত্যক্ষ করেছেন। সেনাকে অপদস্থ করা, সার্জিক্যাল স্ট্রাইক ও এয়ার স্ট্রাইক নিয়ে প্রশ্ন তোলা, সর্বোপরি রোহিঙ্গাদের জামাই আদরে পশ্চিমবঙ্গে স্থান দেওয়া, সীমান্ত এলাকাকে অনুপ্রবেশকারীদের মুক্তাঞ্চলে পরিণত করা ও সেই কারণে বি এস এফ-কে ক্রমাগত অস্বস্তিতে রাখা এবং এরই ফলস্বরূপ এন আর সি-তে বাধাদান— দেশের পক্ষে মমতা ব্যানার্জির কীর্তি অতুলনীয়।

মমতার মুসলমান প্রেমের বহিঃপ্রকাশের তীক্ষ্ণতা এতই বেশি যে হিন্দুভোট ক্রমশ এককাট্টা হচ্ছে এটা তিনি ভালোমতোই বুঝেছেন। নির্বাচনী ইস্তাহারে তাই সালাম রমজানের শুভেচ্ছা এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে তিনি কী কী দিয়েছেন তার সাড়ম্বরে উল্লেখ থাকলেও সেই মাথায় ঘোমটা টানা কঠোর সাম্প্রদায়িকতা যে তিনি এড়ানোর চেষ্টা করেছেন তা নজর করলেই বোঝা যাবে।

মোদীর পক্ষে তাঁর না থাকার কারণটাও সবাই বোঝেন। মোদী জমানায় আপোশহীন ভাবে তাঁর একের পর এক কেলেঙ্কারির তদন্ত শুরু হয়েছে। মোদী ক্ষমতায় থাকলে মমতার সাড়ে সর্বনাশ। সুতরাং মোদী বিরোধিতা তাঁকে করতেই হবে। মোট ৭২ পাতার তৃণমূলের ইস্তাহারটি তন্ন তন্ন করে পড়ে ফেলেও এমন নতুনত্ব কিছু পাওয়া যায় না, যেগুলি তিনি নির্বাচনী জনসভায় এতদিন প্রলাপের মতো বলে গিয়েছেন, তার থেকে আলাদা করা যায়। তবুও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক চরিত্র বুঝতে ইস্তাহারটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

মমতা ব্যানার্জি প্রশাসক হিসেবে অকর্মণ্য হতে পারেন, কিন্তু বিরোধী নেত্রী হিসেবে তিনি সর্বদাই তুখোড়। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তাঁর গ্রহণযোগ্যতার একমাত্র কারণ ছিল আপোশহীন সিপিএম বিরোধিতা কমিউনিস্ট শাসকের নগ্নরূপ, প্রয়োজনে তারা কতটা নির্দয় হতে পারে, এমনকী দেশদ্রোহিতার প্রশ্নেও তারা নির্মমভাবে দেশদ্রোহী, এরকম হাজারো গুণসম্পন্ন সিপিএমকে উৎখাত করতে রাজ্যবাসী প্রস্তুত ছিলেন অনেকদিনই। কিন্তু নির্বাচন জালিয়াতির অভিনব পন্থা আবিষ্কার করেছিল সিপিএম— সাংবাদিক বরুণ সেনগুপ্ত যাকে 'বৈজ্ঞানিক রিগিং' বলতেন। বিরোধী কিছু নেতাকে কিনেও নিয়েছিল তৎকালীন শাসক সিপিএম। যাদের তরমুজ বলা হতো। অর্থাৎ বাইরে সবুজ, ভেতরে লাল। সিপিএম নামক জগদ্দল পাথরকে উৎখাত করা যাবে কেউ ভাবেনি। মমতা ব্যানার্জি এই অসম্ভবকে সম্ভব



করে দেখিয়েছিলেন। তাই তিনি যখন ক্ষমতায় আসেন উন্নয়নের ভাবনা কেউ ভাবেনি। সিপিএমকে উৎখাত করতে হবে--- দলমতনির্বিশেষে সবাই মমতার পাশে এককাট্টা হয়েছিলেন স্রেফ এই আশাতেই।

কিন্তু ক্ষমতায় আসতে সুচতুর মমতা একটি বিশেষ কাজ করলেন, যে কাজের জন্য অধ্যাপক তথা বিশিষ্ট ইঞ্জিনিয়ার ও বর্তমান রাজ্যপাল (মেঘালয়) তথাগত রায় তাঁকে সিপিএমের সবচেয়ে মেধাবী ছাত্রী বলে উল্লেখ করেছিলেন। সেই কাজটি হলো মুসলমান সম্প্রদায়কে তুষ্ট রাখার কৌশল। বাম আমলেই এই ধরনের কর্ম বেশ সুচারুভাবে করা হয়েছিল। মমতা তাকেও ছাপিয়ে গিয়েছেন। সিপিএমকে বেশ বুদ্ধিমান বলতে হবে এখানে। তাদের তুষ্টিকরণের এমন একটা সীমারেখা ছিল, যাতে হিন্দুরা না সচেতন হতে পারে। কিন্তু মমতা সব সীমারেখা ভেঙে দিয়েছেন। সিপিএমের আমলে '৪৬-৪৭-এর পটভূমি পুনরায় নিঃশব্দে রচিত হচ্ছিল, তৃণমূল আমলে তারই বিপদ-সংকেতে হিন্দুরা এককাট্টা হলো। আর হিন্দুদের এককাট্টা করার পেছনে রাজনৈতিক দল হিসাবে বিজেপি ও দলনেতা হিসেবে নরেন্দ্র মোদীর দুর্ধর্ষ ভূমিকা।

এতেই প্রমাদ গুনেছেন মমতা। তাঁর মদতপুষ্ট মুসলমানরা জঙ্গি আচরণে হিন্দুদের যে ক্ষতি গত আট বছর করে এসেছে, বিগত চৌত্রিশ বছরেও এতটা ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। ফলে মুসলমানদের সন্তুষ্ট রাখতে মোদী জুজু মমতাকে দেখাতে হবেই, আবার হিন্দুদের কাছেও বার্তা দিতে হবে। তাই কিছুদিন আগে অক্লেশে তিনি বাচ্চাদের পাঠ্যবইয়ে 'রামধনু'কে 'রংধনু' করে দিয়েছিলেন। আজ তাঁকে রামনবমী পালন করে এর প্রায়শ্চিত্ত করতে হচ্ছে।

তৃণমূলের ইস্তাহারটা পড়লে সকলেই বুঝবেন উগ্র মোদী বিরোধিতা ছাড়া এতে আর কোনও সারবস্তু নেই। মমতার আজ বোঝার সময় এসেছে শুধুমাত্র নেগেটিভ ভোটিং দীর্ঘমেয়াদি ক্ষমতা কায়েম করতে দেয় না। সিপিএম এরাজ্য থেকে উৎখাত হয়েছিল মমতার তথাকথিত 'উন্নয়ন মুখী' কর্মসূচিতে নয়। কোনও পজিটিভ ভোট সেদিন তৃণমূলের ভোটবাক্সে পড়েনি, সিপিএমের প্রতি গভীর ঘৃণায় মানুষ সেদিন তৃণমূলে ভোট দিয়েছিলেন। প্রশাসক হিসেবে মমতা তখন অপরীক্ষিত। সিপিএমের বিরুদ্ধে এই 'পলিটিক্স'ই যে মমতা বিজেপির বিরুদ্ধে কাজে লাগাতে চাইছেন তৃণমূলের ২০১৯-এর লোকসভা ইস্তাহারে স্পষ্টভাবে দেখা গেল। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গবেষকরা আগামীদিনে তৃণমূলের এই ইস্তাহারটিকে সমীক্ষায় আনলে অবশ্যই দেখবেন মমতার রাজনীতিক চরিত্রটাই হলো 'বিরোধিতা', 'উন্নয়ন'-এর ছিঁটেফোঁটাও সেখানে নেই।

সাধারণ ইস্তেহার মানে উন্নয়নমুখী পরিকল্পনাগুলি সাধারণের সামনে রাখা, বিরোধী দল হলে শাসকদলের ত্রুটিগুলিকে তুলে ধরা, ক্ষমতায় এলে প্রতিশ্রুতি রূপায়ণ ইত্যাদি বোঝায়। তৃণমূল তার ইস্তেহারে একটি পরিকল্পনাও দেখাতে পারেনি যেখানে ভারতবর্ষ গড়বার অঙ্গীকার আছে। রাজ্যে তারা কী করেছে, তার পরিসংখ্যান আছে ঠিকই কিন্তু তার সঙ্গে বাস্তবের ফারাকটাও বড়ো বেশি চোখে পড়ে। সব মিলিয়ে ইস্তাহারের নির্যাস অন্ধ মোদী বিরোধিতা। মমতা জানেন না যে সিপিএমের অপশাসনের সঙ্গে মোদীর সুশাসন মেলানো যায় না, এটা হতে পারে না। কিন্তু মুসলমান সম্প্রদায়কে বিজেপি-জুজু দেখাতে না পারলে বিয়াল্লিশে বিয়াল্লিশের স্বপ্নে বড়ো বাধা পড়বে, প্রধানমন্ত্রীর চেয়ার দখলের স্বপ্নও অধরা থেকে যাবে। মমতার মুসলমান প্রেমের বহিঃপ্রকাশের তীক্ষ্ণতা এতই বেশি যে হিন্দুভোট ক্রমশ এককাট্টা হচ্ছে এটা তিনি ভালোমতোই বুঝেছেন। নির্বাচনী ইস্তাহারে তাই সালাম রমজানের শুভেচ্ছা এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে তিনি কী কী দিয়েছেন তার সাড়ম্বরে উল্লেখ থাকলেও সেই মাথায় ঘোমটা টানা কঠোর সাম্প্রদায়িকতা যে তিনি এড়ানোর চেষ্টা করেছেন তা নজর করলেই বোঝা যাবে। এখানেই মোদীর জয়, তাঁর সু-প্রশাসনের কৃতিত্ব। সুতরাং মুসলমানদের 'নেগেটিভ ভোট'-এর আস্থাতেই যে মমতা আরও একবার বাজিমাতের ছক করছেন, এই ইস্তাহার তার দলিলও হয়ে রইল।

সিপিএমের ম্যানিফেস্টোর কিছু ক্লিশে হয়ে যাওয়া, নির্বোধ শব্দচ্চারণকে ধারণ করেই মমতাকে তাঁদের দলের ইস্তাহারে স্বাক্ষরিত বয়ান দিতে হচ্ছে। দেশদ্রোহীরা আজ বুঝেছে সিপিএম দেউলিয়া, তাই তাদের দেশদ্রোহিতার নয়া ঠিকানা তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূলের ইস্তাহার যেন তারই প্রমাণ দিল।

কিন্তু এ যে অত্যন্ত কঠিন ঠাঁই, মমতা কি তা বোঝেন না! বোঝেন বিলক্ষণ। 'ধর্মনিরপেক্ষতা', 'যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো', 'অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচি', 'বহুত্ববাদ', 'মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক অপশক্তি' ইত্যাদি শব্দবন্ধনী আমরা কেবল 'ইস্তাহার' লিখতে অভ্যস্ত একটি দলের ইস্তাহারেই দেখছি। হ্যাঁ ঠিকই ধরেছেন সিপিএমের ম্যানিফেস্টোর কথাই বলা হচ্ছে। অদৃষ্টের এমনই পরিহাস যে সিপিএমের সঙ্গে লড়াই তাঁকে 'মমতা ব্যানার্জি' করল, তাদের ম্যানিফেস্টোর কিছু ক্লিশে হয়ে যাওয়া, নির্বোধ শব্দচ্চারণকে ধারণ করেই মমতাকে তাঁদের দলের ইস্তাহারে স্বাক্ষরিত বয়ান দিতে হচ্ছে। দেশদ্রোহীরা আজ বুঝেছে সিপিএম দেউলিয়া, তাই তাদের দেশদ্রোহিতার নয়া ঠিকানা তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূলের ইস্তাহার যেন তারই প্রমাণ দিল। ▮



কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহার ও জাতীয় নিরাপত্তা এক বিপজ্জনক সম্ভাবনার মুখে গোটা দেশ

বিমল শঙ্কর নন্দ

রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা দিতে গেলে এখনো রাজনীতি বিজ্ঞানের যে কোনো শিক্ষক বা অধ্যাপক ১৮ শতকের বিশিষ্ট ব্রিটিশ চিন্তাবিদ, রাজনীতিক ও বাগ্মী এডমন্ড বার্ক-এর সংজ্ঞার উল্লেখ করেন। এডমন্ড বার্ক (১৭২৯-১৭৯৭) রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছিলেন, "A party is a body of men united for promoting, by their joint endeavours the national interest upon some particular principle in which they are all agreed।" অর্থাৎ একটি রাজনৈতিক দল হলো কিছু মানুষের একটি গোষ্ঠী যা কতগুলো সুনির্দিষ্ট নীতির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে জাতীয় স্বার্থ সম্প্রসারণের চেষ্টা করে। দেশ এবং জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করা রাজনৈতিক দলের এক গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। কারণ দেশের অস্তিত্বই যদি বিপন্ন হয় তবে নীতি, আদর্শ, উন্নয়ন প্রভৃতি ধারণার কোনো প্রয়োজন কিংবা প্রাসঙ্গিকতা থাকে না। দেশই হলো রাজনীতির আধার। মহাশূন্যে কোনো রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার প্রয়োজন থাকে না।

২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচন ঠিক করে দেবে আগামীদিনে দেশের রাজনীতি কোন পথে প্রবাহিত হবে। যে কোনো সাধারণ নির্বাচনে ইস্তাহার প্রকাশও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় একটি পরিচিত প্রথা। ইস্তাহারের মাধ্যমে একটি রাজনৈতিক দল দেশের নাগরিকগণের সামনে তার ভবিষ্যৎ ভাবনা তুলে ধরে। ভবিষ্যতে দেশ ও তার নাগরিকদের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির জন্য কোন নীতি গ্রহণ করা হবে তার একটি দিশা পাওয়া যায় রাজনৈতিক দলগুলির ইস্তাহারে। কিন্তু উন্নয়ন এবং সমৃদ্ধি তখনই সম্ভব যখন দেশ স্থিতিশীল এবং ঐক্যবদ্ধ থাকবে। কিন্তু ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচন উপলক্ষ্যে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রকাশিত নির্বাচনী ইস্তাহারটি পড়ে সেই বহুশ্রুত বিতর্কটি মনে পড়ল— হাঁস আগে না ডিম আগে? হাঁসটিই যদি মরে যায় তবে ডিমের চিন্তা করে লাভ কী? দেশের ঐক্য এবং স্থিতিশীলতাই যদি বিপন্ন হয় তবে উন্নয়ন কিংবা জনগণের কল্যাণ প্রভৃতি ধারণাগুলি কিছু অর্থহীন বাগড়াম্বরে পরিণত হয়। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রকাশিত ৫৫ পাতার ইস্তাহারে দেশবাসীর সামনে উন্নয়ন, কর্মসংস্থান ও গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার অনেক স্বপ্ন ফেরি করা হয়েছে। কিন্তু দেশের ঐক্য ও সুরক্ষা নিয়ে এই ইস্তাহারে এমন কিন্তু পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলা হয়েছে যাতে দেশের ঐক্য এবং অখণ্ডতাই বিপর্যস্ত হতে পারে। এই নিবন্ধে সেই দিকেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো।

ইস্তাহারের ২৪ পাতায় রয়েছে জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত কিছু ভাবনা, যে ভাবনা বিশ্লেষণ করলে জাতীয় নিরাপত্তা সম্পর্কে দলটির দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে কিছু ধারণা পাওয়া সম্ভব। কংগ্রেস নাকি ক্ষমতায় এলে 'নিরাপত্তা খাতে এনডিএ আমলের ক্রমহ্রাসমান বাজেট বরাদ্দকে পুনরায় ঊর্ধ্বমুখী করবে' এবং 'সেনাবাহিনীর আধুনিকীকরণ কর্মসূচি রূপায়িত হবে দ্রুত এবং স্বচ্ছতার সাথে'। এ কথা শুনে কবরে শুয়েও অট্টাভিও কাত্রোচ্চি অট্টহাসিতে ফেটে পড়তে পারে। ১৯৮৬ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস দল পরিচালিত সরকারের আমলে (সে সরকারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন স্বর্গত রাজীব গান্ধী) বোফর্স কামান কেনা নিয়ে বহু কোটি (৬০ কোটি) টাকা ঘুষের অভিযোগ ওঠে এবং বোফর্স চুক্তিতে অন্যতম দালালের ভূমিকা পালন করেছিলেন গান্ধী পরিবারের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ অট্টাভিও কাত্রোচ্চি। কেলেঙ্কারিটি প্রমাণ হয়নি, কারণ এক্ষেত্রে অপরাধীরা হয় অতি ধূর্ত। তবে দুর্নীতির ধারাবাহিকতাও শেষ হয়নি। ১৯৮৬ সালে বোফর্স দুর্নীতি সবার সামনে আসার ঠিক কুড়ি বছর পরে ২০০৬ সালে আর এক কেলেঙ্কারির তথ্য সবার গোচরে আসে। এটি হলো অগুস্তা ওয়েস্টল্যান্ড ভিভিআইপি হেলিকপ্টার কেলেঙ্কারি, যেখানে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কোটি কোটি টাকা ঘুষ দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। যাদের আমলে সেনাবাহিনীর জন্য অস্ত্র কেনা নিয়ে বারংবার দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে তারা ক্ষমতায় এলে সেনাবাহিনীর আধুনিকীকরণ কর্মসূচি রূপায়িত হবে দ্রুত এবং স্বচ্ছতার সঙ্গে একথা শুনলে রেসের মাঠের বাতিল ঘোড়াও হেসে উঠতে পারে। ইস্তাহারের ২৪ নম্বর পাতায় একটি শিরোনাম আছে— Pride in our Hard and Soft Power। কংগ্রেস কোনোদিন ভারতকে একটি শক্তিশালী দেশে পরিণত করতে চায়নি। কংগ্রেসের নীতিই হলো ভারতকে একটি Soft Power হিসাবে রেখে দেওয়া যাকে কেউ



খুশিমতো আঘাত করে যাবে কিন্তু সে প্রত্যাঘাত করবে না। ভারতে জাতীয় কংগ্রেসই সেই দল যে পাকিস্তান সীমান্তে প্রহরারত জওয়ানদের নির্দেশ দিয়েছিল কোনো অবস্থাতেই গুলি না চালাতে, কাশ্মীরে হিংস্র আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে যতটা সম্ভব সংযত আচরণ করতে। তার ফল ভোগ করছে গোটা দেশের মানুষ।

তবে কংগ্রেসের ইস্তাহারের সবচেয়ে বিপজ্জনক দিক হলো দেশদ্রোহিতা এবং সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে আপোশ করার নীতি। ইস্তাহারের ৩৫ নম্বর পৃষ্ঠায় ইন্ডিয়ান পেনাল কোডের ১২৪এ ধারার অবলুপ্তির কথা বলা হয়েছে যে ধারায় দেশদ্রোহিতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সংস্থান আছে। দেশের নাম করা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যখন আওয়াজ ওঠে 'ভারত তেরে টুকরে হোঙ্গে— ইনসাল্লা, ইনসাল্লা' তখন দেশদ্রোহিতা বিষয়ক বিধিব্যবস্থার অবলুপ্তি ঘটালে গোটা দেশে 'টুকরে টুকরে গ্যাং'-এরই বাড়বাড়ন্ত হবে। ৪০ নম্বর পৃষ্ঠায় আরও একটি বিপজ্জনক ঘোষণা— ''The Armed Forces (Special Powers) Act and the disturbed Area Act in J & K will be reviewed." অথচ AFSPA আইন প্রণীত হয় কংগ্রেস আমলে, ১৯৫৮ সালে। এই আইন এবং ১৯৭৬ সালে প্রণীত Disturbed Area Act ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে সন্ত্রাস দমনের অন্যতম হাতিয়ার। অন্য সবকিছুর মতো সন্ত্রাসবাদও তার চরিত্র বদলেছে। পার্শ্ববর্তী কিছু দেশের প্ররোচনা এবং মদতে সন্ত্রাসবাদীরা এখন অনেক বেপরোয়া, তাদের হাতে এখন অত্যাধুনিক অস্ত্র। ভারতের সেনাবাহিনী তাদের বিরুদ্ধে নিরন্তর লড়াই করছে। বিগত পাঁচ বছর কেন্দ্রীয় সরকার জম্মু ও কাশ্মীর এবং উত্তরপূর্ব ভারতে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স নীতি' নেওয়ার কারণে সন্ত্রাসবাদী এবং জেহাদিরা একেবারে কোণঠাসা। সংঘর্ষের সংখ্যা বেড়েছে, কারণ সন্ত্রাসবাদীরা মরিয়া হয়ে নিরাপত্তা বাহিনীকে আক্রমণ করছে। নিরাপত্তা বাহিনীও বহু সন্ত্রাসবাদীকে নিকেশ করেছে যার মধ্যে আছে বুরহান ওয়ানির মতো আধুনিক শিক্ষিত সন্ত্রাসবাদী। এই সময় AFSPA এবং Disturbed Area Act তুলে দিলে নিরাপত্তা বাহিনীর মনোবল ধাক্কা খাবে, উৎসাহিত হবে সন্ত্রাসবাদী এবং জেহাদি গোষ্ঠী। এরপর কাশ্মীরকে ভারতের মানচিত্রে ধরে রাখা সম্ভব হবে তো? ১৮১৭ থেকে ১৯১২ সালের মধ্যে অটোমান সাম্রাজ্য এবং অস্ট্রো হাঙ্গেরিয় সাম্রাজ্যের অধীনে থাকা ইউরোপের বলকান অঞ্চল টুকরো টুকরো হয়ে যায়। জন্ম নেয় বেশ কয়েকটি স্বাধীন দেশ। এরপর ইংরেজি অভিধানে Balkanisation নামক ভূ-রাজনৈতিক শব্দটি অন্তর্ভুক্ত হয়। কংগ্রেসের নীতি এদেশে Balkanisation-এর পথকে প্রশস্ত করবে না তো? ভারতের অন্যতম সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্লোগান উঠেছিল 'ভারত তেরে টুকরে হোঙ্গে— ইনসাল্লা, ইনসাল্লা'। কংগ্রেসের বর্তমান সভাপতি তার নিন্দে করেননি। বরং তাঁকে তাদের পাশে দাঁড়াতে দেখা গিয়েছিল।

জাতিকে ঐক্যবদ্ধ রাখে জাতীয়তাবোধ। তাকে ধ্বংস করে সংকীর্ণ রাজনীতি। যে সংগঠন এক সময় দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু ছিল, ক্ষমতার জন্য সে আজ দেশকেও ভয়ংকর বিপদের মুখে ঠেলে দিতে প্রস্তুত।

জাতিকে ঐক্যবদ্ধ রাখে জাতীয়তাবোধ। তাকে ধ্বংস করে সংকীর্ণ রাজনীতি। যে সংগঠন এক সময় দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু ছিল, ক্ষমতার জন্য সে আজ দেশকেও ভয়ংকর বিপদের মুখে ঠেলে দিতে প্রস্তুত। এবার নির্বাচনে পরাজিত হলে আদৌ সংগঠনটি টিকে থাকবে তো? ভবিষ্যৎই এর উত্তর দেবে।



Italian media hints at Cong link to copter scam

Beneficiaries claimed to include Indian partners of Emaar-MGF

J GOPIKRISHNAN ■ NEW DELHI

Like the Bofors scam, the AgustaWestland chopper deal too has telltale signs of a Congress connection. According to the Italian newspaper *'Lettera 43'*, main commission agent Christian Michel's late father was "close to the Congress party", and the other middleman, Guido Ralph Haschke, was a Director of Emaar-MGF, a real-estate company owned by relatives of Kanishka Singh, who is associated with a Congress high-up. Michel was also the agent of Dassault, which has emerged as the lowest bidder for the Indian Air Force's 10 billion dollar deal for Rafale fighter jets, supposed to be the world's biggest tender.

According to the Italian newspaper report on November 20, 2012, the "mysterious" British citizen Michel, described as "Man of Beans", had received 60 per cent (around ₹210 crore) of the kickback amount of 51 million Euros (around ₹360 crore)...

CAN OF WORMS

- According to the Italian newspaper 'Lettera 43', main commission agent Christian Michel's late father was 'close' to the Congress party
- Another middleman, Guido Ralph Haschke, was a Director of Emaar-MGF, a real estate company owned by relatives of Kanishka Singh, who is associated with a Congress high-up. Haschke is neither a builder nor a real estate entrepreneur, so his connection with Emaar-MGF is bound to raise eyebrows
- Michel, described as 'Man of Beans', had received 60 per cent (around ₹210 crore) of the kickback amount of 51 million Euros (around ₹360 crore) from the Finmeccanica
- According to these reports, in 2004, Michel sued Dassault over non-payment of commission for the purchase of Mirage aircraft for Indian Air Force in 2000
- Italian prosecutors investigating Defence giant Finmeccanica say that in addition to bribing officials for a 12-helicopter deal, the company discussed kickbacks for a larger deal as well with a serving Brigadier in the Indian Army
- The Italian enquiry says that in 2003, a serving Brigadier of the Indian Army allegedly demanded five million dollars to influence a contract for 197 light helicopters in favour of Finmeccanica's subsidiary, AgustaWestland
- The deal is on hold, and AgustaWestland did not make the shortlist for the tender, but the Italian report says that instead of disclosing the offer made by a man identified as 'Brigadier Sahi', the company said he should be 'more patient and we will give you an answer at the end of the competition'

Defence Ministry blames MEA for tying its hands

PNS ■ NEW DELHI

Facing flak for its inaction for the last one year in the AgustaWestland VVIP helicopter deal, the Defence Ministry on Thursday pointed the finger at the Ministry of External Affairs (MEA) for not extending the desired cooperation.

The Defence Ministry's six-page clarification claims that the Defence Secretary wrote to the Secretary (West), MEA, in October 2012 reiterating its urgency to get information from the Italian authorities so that the Defence Ministry could take further necessary action in this regard.

"MEA's response again was that the matter had been taken up with the Italian side and the position conveyed for the need for 'reliable information', for "news reports alone could not be the basis for the Ministry of Defence to make any preliminary determination," the Defence Ministry has claimed.

In October 2012, the Defence Secretary wrote to the Secretary (West) to take up the matter with the UK Government in view of the alleged involvement of a British citizen and the fact that the contract was signed with M/s AgustaWestland, UK.

In November 2012, the Secretary (West), MEA, replied to the Defence Secretary stating that "the UK authorities were waiting for the results of the Italian investigation in order to ascertain whether there are further action to take".

The Defence Ministry has claimed that after the first report in the media appeared in February 2012, its Def (Acquisition) sought a factual report in the matter from the Indian Embassy in Rome.

In April 2012, the Defence Ministry again wrote to the Indian Embassy in Rome seeking an update. "A detailed report on the status of the case was received from our Embassy in Rome in May 2012. The report made it clear that there are inherent difficulties in obtaining formal details of the case given the independence of the judiciary from the executive in Italy," the Defence Ministry communiqué said.

The Ministry in July 2012 wrote to the Indian Embassy in Rome stating that it could approach the concerned judicial authorities directly and a formal request was indeed made by the embassy to the Naples prosecutor's office on July 16, 2012, it said.

Information denied!

- Defence Ministry on Thursday pointed a finger at the MEA for not giving the desired cooperation
- MoD again wrote to the Indian Embassy in Rome in April 2012 seeking an update
- Throughout the process of this case, the Defence Ministry said it was prompt to take action on even newspaper reports, as the MEA could not provide the desired information

Continued on Page

ধুলাগড়ীতে পাওয়ার বল টুর্নামেন্ট

গত ৩ এপ্রিল হাওড়া জেলার ধুলাগড়ী দাসপাড়া নবোদয় কল্যাণ সমিতি এবং ক্রীড়া ভারতীর যৌথ উদ্যোগে ১৬ দলীয় পাওয়ার টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ১৬ টি ক্লাব টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করে। বিশেষ অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়া ভারতীর জেলা পদাধিকারী বিশিষ্ট ফুটবলার রামকৃষ্ণ বেরা ও শুভেন্দু সরকার। টুর্নামেন্টে কুলডাঙ্গা স্বপ্নদেখা রাজকন্যা ক্লাব স্থান এবং ধুলাগড়ী বটতলা মা কালী সঙ্ঘ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। বিজয়ী দুই দলের অধিনায়কের হাতে ট্রফি তুলে দেন রামকৃষ্ণ বেরা।



দুর্গাপুরে বিবেকানন্দ বিকাশ পরিষদের বার্ষিক অনুষ্ঠান

গত ৬ এপ্রিল পশ্চিম বর্ধমান জেলার দুর্গাপুর শহরে বিবেকানন্দ বিকাশ পরিষদের বার্ষিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় এ-জোন স্থিত রবীন্দ্র ভবনের সভাকক্ষে। অনুষ্ঠানে সংস্কৃত শ্লোক প্রতিযোগিতা, সেলাই কেন্দ্র ও কম্পিউটার কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের শংসাপত্র প্রদান, স্বাবলম্বন গোষ্ঠীর নির্মিত দ্রব্যের প্রদর্শনী ও বিক্রি এবং বনবাসী নৃত্য অনুষ্ঠানের অঙ্গ ছিল। উল্লেখ্য, দুর্গাপুর শহরে বিবেকানন্দ বিকাশ পরিষদ ১৯৮৯ সালে থেকে এলাকায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও স্বাবলম্বনের কাজ করে চলেছে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিধান ইনস্টিটিউশনের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ উজ্জ্বল সরকার। বিশেষ ভাবে উপস্থিত ছিলেন সেবা ভারতীর রাষ্ট্রীয় সংযোজক গুরুশরণ প্রসাদ।

কলকাতায় অসোয়াল ভবনে রাজস্থান দিবস সমারোহ সভা

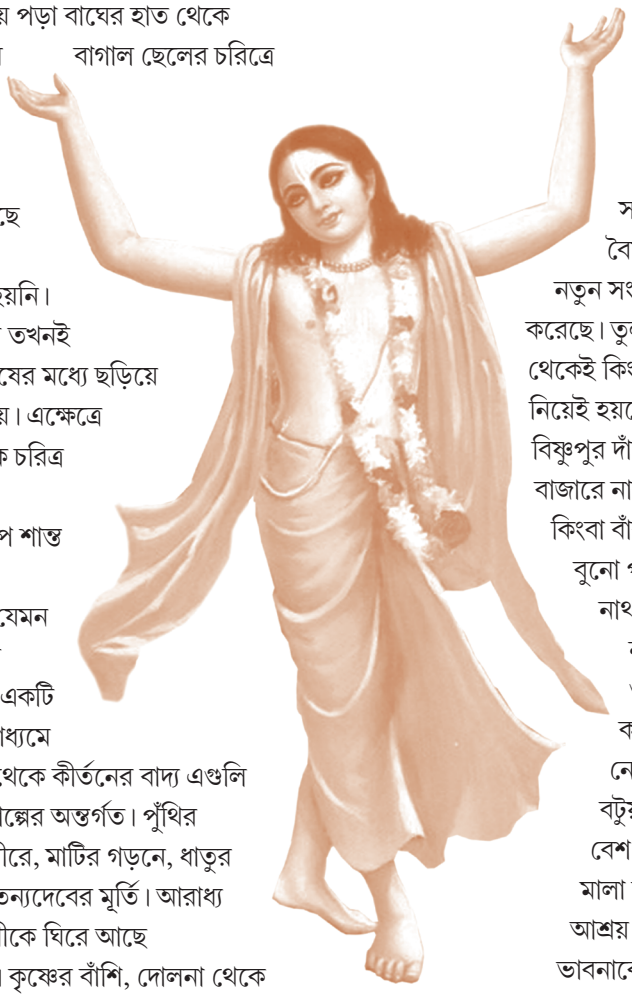
গত ৩১ মার্চ কলকাতার বড়বাজারের অসোয়াল ভবনে রাজস্থান পরিষদের উদ্যোগে ৩০ তম রাজস্থান দিবস সমারোহ সভার আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী। প্রধান অতিথি এবং বিশিষ্ট অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে বেণুগোপাল বাংগড় ও ড. প্রেমশঙ্কর ত্রিপাঠী। রাজ্যপাল তাঁর ভাষণে বলেন, রাজস্থানি সমাজের মানুষরা কলকাতায় থেকেও তাঁদের জন্মভূমি রাজস্থনের প্রতি অনুরাগ রাখেন। রাজস্থানের সভ্যতা-সংস্কৃতি প্রাণবন্ত রেখেও পশ্চিমবঙ্গের সমৃদ্ধিতে তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করেছেন। রাজ্যপাল মহোদয় অনুষ্ঠানে রাজস্থান পরিষদের 'বিকশিত রাজস্থান' স্মারক পত্রিকার উন্মোচন করেন। অনুষ্ঠানে পারিক সভার সালিরাম পুরোহিত, চন্মালাল পারিক, রামনিবাস জোশী, মুলতান পারিক প্রমুখ পুলওয়ামায় বীরগতিপ্রাপ্ত সেনা জওয়ানদের পরিবারের জন্য ৫১ হাজার টাকার চেক রাজ্যপালের হাতে তুলে দেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে জনপ্রিয় সংগীতগায়ক নবীন ব্যাস ' জয় জয় রাজস্থান' গীত পরিবেশন করেন। স্বাগত ভাষণ দেন পরিষদের শার্দূল সিংহ জৈন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বিশিষ্ট রাজস্থানি কবি বংশীধর শর্মা এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অরুণ প্রকাশ মল্লাবত।



বাঙ্গলার লোকশিল্পে শ্রীচৈতন্য

চূড়ামণি হাটি

বঙ্গ সংস্কৃতিকে শ্রীচৈতন্য খুব ভালো ভাবে জানতেন বলেই বাংলার সংস্কৃতিকে তিনি প্রভাবিত করতে পেরেছিলেন। ভিন দেশিদের আক্রমণের মাঝে থেকেও সুকৌশলে চক্রধারী কৃষ্ণকে আড়াল করেছিলেন আরাধিকা শ্রীরাধিকার ভক্ত হৃদয়কে প্রতিষ্ঠা দিতে। হিন্দুদের অন্য দেবদেবী ভিনদেশিদের ভয় দেখালেও রাধা-কৃষ্ণের যুগল মূর্তি এ ভয় থেকে অনেকটা মুক্তি দিল। আলযুক্ত কৃষি ভূখণ্ডে চরে বেড়ানো গোরুর; নিকটবর্তী জঙ্গল থেকে বেরিয়ে পড়া বাঘের হাত থেকে রক্ষাকারী কোনো কৃষ্ণবর্ণের বাগাল ছেলের চরিত্রে একের পর এক জুড়ে যাওয়া লৌকিক-অলৌকিক কাহিনিতে প্রস্তুত কৃষ্ণ চরিত্রটিকেই শ্রীচৈতন্যদেব বেছে নিয়েছিলেন। যার সঙ্গে রাধার কাহিনিটি জুড়ে দেওয়া সম্ভব হয়নি। আবেগের মুহূর্ত যখন শেষ হয় তখনই রাজনীতি শুরু; রাজনীতি মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে থাকা আবেগকেই কাজে লাগায়। এক্ষেত্রে চক্রধারী শ্রীকৃষ্ণকে রাজনৈতিক চরিত্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রেও শ্রীচৈতন্যদেব সফল। ফলস্বরূপ শান্ত পরিবেশ রচনা করে বাঙ্গলার লোকশিল্পের বেশ কিছু ধারা; যেমন এ ব্যক্তিত্বের মতের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলেছে; তেমনি আর একটি ধারা এ ব্যক্তিত্বের রূপ নানা মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছে। মালা-বটুয়া থেকে কীর্তনের বাদ্য এগুলি সবই ঐতিহ্যের ধারায় লোকশিল্পের অন্তর্গত। পুঁথির পাটা, পটের গানে, কাঠের শরীরে, মাটির গড়নে, ধাতুর লাবণ্যে গুরুত্ব পেয়েছে শ্রীচৈতন্যদেবের মূর্তি। আরাধ্য রাধা-কৃষ্ণকে এবং জগন্নাথ ত্রয়ীকে ঘিরে আছে রথ-সিংহাসন এবং নানা সাজ। কৃষ্ণের বাঁশি, দোলনা থেকে শুরু করে কাঁধে বাঁক নেওয়া কিংবা শিকের ভেতর মাখন ভরা মাটির হাড়ি এই সবই লোকশিল্পের এক এক ছবি নিয়ে বাঙ্গলা সংস্কৃতিতে উপস্থিত। পট থেকে সরায় রাধা-কৃষ্ণের উপস্থিতি তো রয়েছেই মন্দিরের পোড়ামাটির ফলক থেকে নকশি কাঁথাতেও বিগ্রহ মূর্তি তো রয়েছে।



শঙ্খচূড় দৈত্য। কিন্তু দৈত্য বিনাশ প্রয়োজন। এদিকে ব্রহ্মার বরে স্ত্রীর সতীত্বগুণে শঙ্খচূড় অমর। নারায়ণ ছল করে শঙ্খচূড়ের ছদ্মবেশ নিয়ে শঙ্খচূড়ের স্ত্রী তুলসীর সঙ্গে মিলিত হলেন। এর ফলে শিবের ত্রিশূলে শঙ্খচূড় বধ সম্ভব হলো। একখণ্ড মাংস লেগে থাকা ত্রিশূলটি শিব সমুদ্রে নিক্ষেপ করেন। শিবের ইচ্ছায় সেই মাংস টুকরোই শঙ্খ এবং হিন্দু রমণীর মাতৃত্বের অংশ হলো। এদিকে লজ্জা ঘৃণায় শঙ্খচূড়ের স্ত্রী তুলসী বৃক্ষের রূপ নিলেন। আর একটি মতে, তুলসী নামে কেউ কৃষ্ণের অন্যতম গোপিনী ছিলেন। রাধার অভিশাপে তুলসী বৃক্ষরূপ পেল। যাইহোক, এই তুলসীর মালা হিন্দুদের নানা লৌকিক আচারে ব্যবহৃত। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পর তার দেখানো ভাবধারায় ওই মালার গুরুত্ব গেল বেড়ে। শ্রীচৈতন্যদেবের দেখানো রাস্তায়, প্রতিবাদী চিন্তা থেকে জাগ্রত লোকধর্মের যে সকল মত তৈরি হয়েছিল তারাও বৈষ্ণব মতের সঙ্গে তাল রেখে নতুন সংস্কৃতিক জগতের অনুসঙ্গ করেছে। তুলসীর মালার জোগানের অভাব থেকেই কিংবা সম নান্দনিকতার পরিচয় নিয়েই হয়তো সৃষ্টি হয়েছে বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর দাঁড়িকার বেলমালা, শাঁখাড়ি বাজারে নারকেলের বা আইচার মালা কিংবা বাঁকুড়ার বালসীতে তৈরি হওয়া বুনো পরাসী কাঠিমালা। কালনার নাথ সম্প্রদায়ের তৈরি মালা বেশ নাম করেছে। কুন, ছক, ধনুক, গুনো, সূচ এগুলিকে আশ্রয় করে নিয়েই মালা তৈরি করে নেন শিল্পীরা। ধুতির বাঁধনে রাখা বটুয়াথলে এক সময় পয়সা রাখতে বেশ ব্যবহৃত হতো। তেমনি সখের মালা রাখতে এই তুচ্ছ বস্তুটিকেই আশ্রয় করা হয়েছে। হয়তো এ ভাবনাকে আশ্রয় করে তৈরি হয়েছে

তিনকোণ একত্রিত করা বটুয়া বা দূর্জটি নকশি কাঁথা। এ কাঁথা পুরনো সুতির কাপড় ও পাড়ের সুতো দিয়ে তৈরি চিত্রমাধুর্য নিয়ে ঢাকনি বা চাঁদোয়া হিসেবে ব্যবহৃত কাঁথার পিঠে স্থান করে নিয়েছে শ্রীকৃষ্ণের রাসবিলাস থেকে কালিয়াদমন। এমনই এক মাধুর্য নিয়ে সরা চিত্রেরও বিষয় হয়েছে রাধা-কৃষ্ণ। যা মূলত লক্ষ্মীর চিত্ররূপ নিয়ে কোজাগরী লক্ষ্মী পুজোয় ব্যবহৃত হয়। দশ থেকে ত্রিশ ইঞ্চি ব্যাসের উত্তল-অবতল বিশিষ্ট পোড়ামাটির চক্রকার গঠন এই গড়ানো ঢেউয়ে ফুটে ওঠে ছবি। ননীচোর কৃষ্ণের কথা স্মরণে এলেই ভেসে ওঠে বিনুনি বাঁধার কৌশলে তৈরি পাট কিংবা সুতোর শিকে। ঝুলে থাকা শিকেতেই থাকতো হাঁড়ি। শ্রীচৈতন্যের ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শখের হাঁড়ি রঙিনও হয়েছে। মাটির হাড়ির জমি আড়াআড়ি ও লম্বালম্বি রেখা দিয়ে চৌকন করে; তার মধ্যে কালো, লাল, হলদে রেখা দিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চৌকোণ। পরবর্তীকালে আঁকার বিষয় হয়েছে বিবিধ। শুধু হাড়ি ভাঙা নয়, কাঁধে বাঁকও নিয়েছেন। এ লীলাচক্রে ভগবান ভক্তের কাছে উপস্থিত।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্য এ দু' চরিত্রই পটের বিষয় হয়েছে। পট আঁকা নয়। পট লেখা হয়। মূল কাহিনি নিজের মতো করে লেখ্যচিত্র। মুখ-মুঠো, হাতি-ঘোড়া প্রভৃতি নিয়ে চিত্র লেখা। পটিদার মিস্ত্রি কাপড় বা কাগজের উপর প্রাকৃতিক উপকরণ থেকে সংগৃহীত রং দিয়ে তুলির সাহায্যে তা প্রকাশ করেন। পটুয়া চিত্রকর গাইনরা এই পটের ছবি দেখিয়েই গান করেন। গৌরাঙ্গ লীলা ভিত্তিক পটের পাশাপাশি তৈরি হয়েছে বৈষ্ণবদের ধর্মপ্রচারের কাহিনি নিয়ে গোঁসাই পটও। শুধু পট নয়, পুঁথির পাটার গায়ে চিত্রের বিষয়ও হয়েছে নিমাই সন্ন্যাস, শ্রীকৃষ্ণ-সহ অন্যান্য দেবদেবী এবং তাদের ঘিরে নানা ঘটনা পুঁথির পাটাচিত্রের বিষয় হয়েছে। কাহিনির জোরে পুতুল নাচের বিষয়ও হয়েছে কৃষ্ণলীলা। ডাং পুতুলগুলি হয় পারিজাত কাঠের কিংবা যজ্ঞডুমুর, পাকুড় কাঠের। ঘঘরা ধরনের বস্ত্র পরা পুতুলটির কোমরের তলায় থাকা ছিদ্রে একটি লাঠি ঢুকিয়ে শিল্পীরা নীচে পর্দার আড়ালে থেকে তুলে ধরেন। সুতো পুতুলগুলি শোলা, কাদামাটি রং, ন্যাকড়া কাপড়, সুতো-তার দিয়ে তৈরি। এক্ষেত্রে উঁচু স্থানে বসে সূত্রধররা সুতো বা তারে টান মেরে পুতুল নাচান। গামার, মেহগনি শিমুল, আমড়া, ছাতিম ও নিমকাঠের তৈরি বর্ধমান নতুন গ্রামের গৌর-নিতাই রূপটি বেশ জনপ্রিয় ছিল এক সময়। কাঠের চতুর্দোলা সিংহাসনের ব্যবহার দোল ও রাস উৎসব উপলক্ষ্যে। বর্তমানে দোলনাই বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। নানা মূর্তি দিয়ে সাজানো রথ কাষ্ঠ-ভাস্কর্য শিল্পের প্রযুক্তি নির্ভর উল্লেখযোগ্য দিক। এ রথ পিতল-লোহারও হয়েছে। যাইহোক, বৈষ্ণব মঠ মন্দিরকে কেন্দ্র করে কাঠের বিগ্রহ নির্মাণ বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। এমনকী এক্ষেত্রে গাছ বসানো থেকে কাচ পুরোটাই নিষ্ঠার সঙ্গে করা হয়। কাঠের কাঠামো নিয়ে তৈরি হয়েছে কিছু বাদ্য। এক সময় বিষ্ণুপুরের সূত্রধরেরা বাদ্যের গায়ে নক্‌শা পর্যন্ত তুলেছে। কিন্তু খোল মাটির তৈরি চর্মখাদ্য। তাই খোলকে 'মৃৎ' শব্দের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মৃদঙ্গ বলা হয়। বাঁশি বাঁশের তৈরি। করতাল কাঁসা নির্মিত একই আকারের দুটি পাতলা প্লেট। যার মধ্যস্থল অবতল। প্রতিটির মাঝে একটি দড়ি লাগানো। দুটি হাতে দুটি প্লেট নিয়ে আঘাত করে শব্দ সৃষ্টি করা হয়। কাঁসা পেতলকে আশ্রয় করে নবদ্বীপ নাম করেছে ঠাকুরের সিংহাসন তৈরিতে। নবদ্বীপে পূজিত গৌরাঙ্গ মূর্তিটি শান্তিপুরের ব্রজলাল দাস মহাশয়ের তৈরি। পিতল ঢালাই করে কিংবা পিতল মিশ্রিত অষ্ট ধাতু দিয়ে অনেক মূর্তিই তৈরি হয়েছে নবদ্বীপ, কালীঘাট, নতুনবাজার, উল্টোডাঙ্গা সহ নানা স্থানে। পাথরের বিগ্রহ বাঁকুড়ার ছাতনা, বর্ধমানের কাটোয়া, মেদিনীপুরের বেলপাহাড়ি, দার্জিলিংয়ে নকশালবাড়ি, কলকাতায় তৈরি। কলকাতার বুকে প্রথমপর্বে কাঠ খোদাই মুদ্রণচিত্রে গুরুত্ব পেয়েছেন শ্রীচৈতন্যদেব। এ মাধ্যমটি ধাক্কা দিয়েছিল কালীঘাটের চৌকো পটগুলিকেও। যেখানে নানা বিষয়ের সঙ্গে স্থান পেয়েছিলেন শ্রীচৈত্যদেব। কালীঘাট শৈলীর বাইরেও তৈরি চৌকো পটে মূলত গুরুত্ব পেয়েছিল চৈতন্য-সংকীর্তন।

কৃষ্ণ যেন ঋষিতেজকে আড়াল করে রাখাল বালক হয়েই দুষ্টদের বধ করতে ও বশ করতে এসেছেন, কিংবা কখনো রাজনৈতিক চরিত্র হয়ে আড়ালে থেকে মিথ্যার উপর দাঁড়িয়ে থাকা শক্তিশালী আর্য এবং সত্যের ঘরে দাঁড়িয়ে থাকা শক্তিশালী অনার্য বধ করিয়েছেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্য রাখাল বীরের বাঁশিতে সুর তুলে বাঙ্গলার সংস্কৃতিকে অন্যরূপে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। কোচবিহারের 'কানাই ধামলী' গান ও বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম সহ ঝাড়খণ্ড অঞ্চলের ঝুমুর গান এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য, পাঁচালি বৈষ্ণবপদাবলী— এ সব কিছুই মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

নদীয়ার নবদ্বীপের গৌর চৈতন্য এবং বীরভূমের একচক্রা গ্রামের নিতাই— এ দুয়ে তাদের ভাবনাকে মিশিয়ে দিতে চেয়েছেন লৌকিক ভাবধারাকে আশ্রয় করেই। যার প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেনি বাঙ্গলার লোকশিল্পও। শ্রীকৃষ্ণের পাশাপাশি গুরুত্ব পেয়েছেন ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দে আবির্ভূত শ্রীচৈতন্যদেবও। সহজেই লোকশিল্পের ঘর ছুঁয়ে গেছে এই প্রেমতরঙ্গের মায়াবী সুর।■



প্রাণেশ্বর শ্যামাচরণ

অমিত ঘোষ দস্তিদার

ভারতবর্ষ চিরকালই মানুষকে মনানন্দে থেকে প্রকৃতিজাত লীলারস আস্বাদনরত সাধনার কথাই বলে এসেছে। প্রকৃতির সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন সময় থেকে ভারতবর্ষ আলোকের দূত হয়ে বিশ্বকে আলোর সন্ধান দিয়ে চলেছে। শান্তি ও কল্যাণ বিধানরত ভারতবর্ষ সকলের জন্য যে ধর্মের দ্বার খোলা রেখেছে, যে উদারতা আজও দেখিয়ে চলেছে তা বিরল। ধর্মের ঘরের ভিতর মানুষকে প্রবেশ করার আহ্বান জানিয়ে স্মরণাতীতকাল থেকে আজও মহানপ্রাণময় পুরুষেরা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়ে দেবার কার্যে ব্যাপ্ত থেকে চলেছেন। এমনই এক মহান প্রাণময় গৃহী যোগীরাজ শ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী। তিনি ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দের ৩০ সেপ্টেম্বর অপরপক্ষীয় সপ্তমী তিথিতে নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরের ঘূর্ণী অঞ্চলে আবির্ভূত হন। পিতা গৌরমোহন ও মাতা মুক্তকেশী। তাঁরা পরে কাশীবাসী হয়েছিলেন। শিক্ষা ও কর্মজীবনের সূত্রপাত কাশীতেই। কাশীমণি দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। সংসার জীবনে তাঁর দুই পুত্র এবং তিন কন্যা। কর্মজীবনে শ্যামাচরণ ছিলেন মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের পূর্ত দপ্তরের ব্যারাকমাস্টার বা এস ডি ও। রানিক্ষেতের দ্রোণগিরি পর্বতের এক গুহায় বাবাজী মহারাজের নিকট তাঁর ক্রিয়াযোগে দীক্ষা লাভ হয়। ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দের ২৬ সেপ্টেম্বর পবিত্র শারদীয়া দুর্গাপূজার মহাষ্টমী ও মহানবমীর সন্ধিক্ষণে গৃহীরূপী গৃহীর ভগবান শ্রীশ্রীশ্যামাচরণ দিব্যতনু ত্যাগ করেন। প্রাণ অবিনাশী। অবিনাশী প্রাণের সমস্ত কোষ অর্থাৎ মনকোষ, দেহকোষ, প্রাণকোষ, বিজ্ঞানময়কোষ, আনন্দময়কোষ সবই ভগবানময় হয়ে যায়।

ভারতভূমির আত্মজ আত্মা থেকে জাত শ্যামাচরণ তাঁর উপলব্ধি বিবরণে লিখেছেন— 'যিনি আত্মসূর্য তিনি ব্রহ্ম...।' পাতঞ্জল যোগশাস্ত্র কথিত যোগ বা ভারতের সনাতন সাধনপদ্ধতি হলো ক্রিয়াযোগ। শরীরস্থ প্রাণসত্তার সন্ধানপূর্বক সেই প্রাণরাম বা আত্মারামের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দেওয়াই হলো ক্রিয়াযোগ। শাস্ত্রে এই প্রাণের উদ্দেশ্যেই বলা হয়েছে— 'প্রাণোহি ভগবানীশঃ প্রাণো বিষ্ণুঃ পিতামহঃ। প্রাণেন ধার্য্যতে লোকঃ সর্বং প্রাণময় জগৎ।' শ্যামাচরণ এই জন্যই গৃহীর ভগবান, কারণ তিনি অফিস-সংসার-গৃহ-সমাজ ইত্যাদির মধ্যে থেকেও দায়িত্ববান থেকে কী করে ঈশ্বর সাধনায় যাওয়া যায় সেই পথের হদিশ মানুষকে দিয়ে গেছেন। ঠিক যেমনভাবে শ্রীমদ্ ত্রৈলঙ্গস্বামী, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, সাধক বামদেব দেখিয়ে গেছেন তাঁদের মহান কাজ সহজ সরলভাবে গৃহী মানুষকে। সমস্ত দায়দায়িত্ব পালনের পরে মহান ক্রিয়াযোগে সাধনার মাধ্যমে অধ্যাত্ম অনুভূতির চরম শীর্ষে পদ্মাসনে থেকেছেন ও সহজ সরল ভাবে ব্রহ্মের স্তুতি এবং কৃষ্ণ-মহাদেব-চতুর্ভুজ নারায়ণের সঙ্গে মানুষের সরল বিশ্বাসকে পাথেয় করে মানুষের হাত ধরে ঈশ্বর সমীপে নিয়ে গেছেন। তাঁর দেখানো পথে সাধনার জন্য শুধুই আত্মিক অনুভূতি এবং সরলবিশ্বাসময় আস্থাটুকু থাকলেই হবে।



সেখানে কোনো বাহ্য উপাচার বা আড়ম্বরের প্রয়োজন হয় না। শুধুমাত্র প্রাণধর্মরূপ আত্মসাধনা করে গেলেই হলো। সাধনার ভিত্তিভূমি হলো যোগ। সনাতন ভারতের সমস্ত সম্প্রদায়ের সাধনার মেরুদণ্ডই হলো যোগ। শ্রদ্ধা, ভক্তি, নিষ্ঠা, ধৈর্য, অধ্যাবসায়সহ সাধনযোগে মনকে ব্যস্ত রাখতে হবে সদা প্রাণ কর্মে।

যোগীরাজ শ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী ছাড়া আর যাঁরা অন্য সাধনমার্গে থেকেও ক্রিয়াযোগ সাধন করে মুক্তিমার্গের পথ প্রস্তুত করেছিলেন তাঁরা হলেন— ভাস্করানন্দ সরস্বতী, বালানন্দ ব্রহ্মচারী, বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী, শিরডির সাঁইবাবা, ঠাকুর সীতারাম দাস ওঁঙ্কারনাথ প্রমুখ। শ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ীর মতো এবং পথ অনুসরণ করে ব্রহ্মবিদ্যার ধারাকে যাঁরা আজও অক্ষুণ্ণ রেখেছেন তাঁরা হলেন— পণ্ডিত পঞ্চানন ভট্টাচার্য, ব্রহ্মচারী হরিনারায়ণ পালধি, তিনকড়ি লাহিড়ী (পুত্র), শ্রীঅন্নদাচরণ শাস্ত্রী, শ্রীসুন্দরলাল লালাজী, শ্রীসত্যচরণ লাহিড়ী, যোগাচার্য বাচস্পতি, অশোক কুমার চট্টোপাধ্যায়। ১৯৮৬ সালে পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগনার পুণ্য সাগরতীর্থের অনতিদূরে কাকদ্বীপ শহরের উপকণ্ঠে ক্রিয়াধর্মজগতের বিশ্ব মঞ্চরূপে 'যোগিরাজ শ্যামাচরণ সনাতন মিশন' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

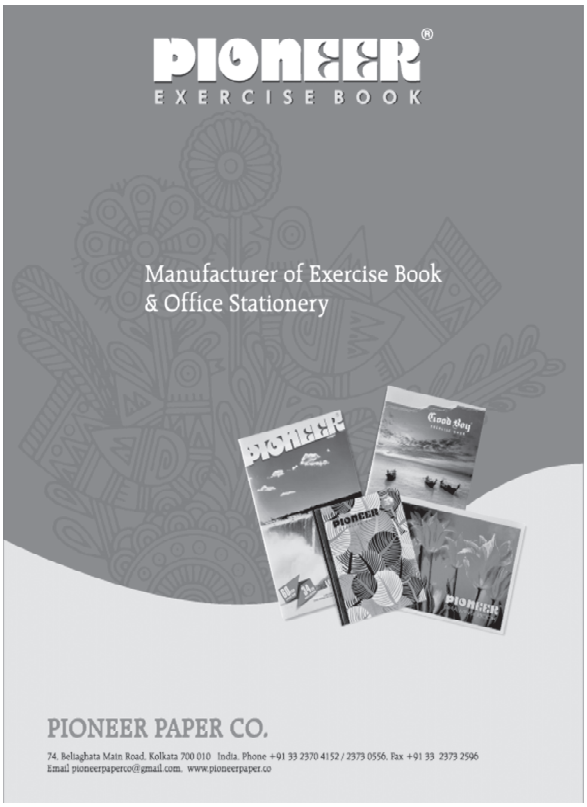
ভারত কখনও মানুষকে মানুষ হত্যা শেখায় না। বরং যুগে যুগে সংখ্যাতীত মহাপুরুষদের আবির্ভাবে এই দেশ ধন্য হয়েছে এবং তাঁদের উত্তরসূরি হিসাবে মানুষ অধ্যাত্মচেতনা বিকাশে প্রতি মুহূর্তেই তৎপর ভাবে কাজ করে চলেছে। প্রাণ যদি প্রাণকে মনের মতো করে নিয়ে আত্মিক বন্ধনে বাঁধতে পারে, তবে সেই মহিমাগীত মানবকুলের জয়গীত হয়ে দিকে দিকে কল্যাণবিধান করে। ■

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

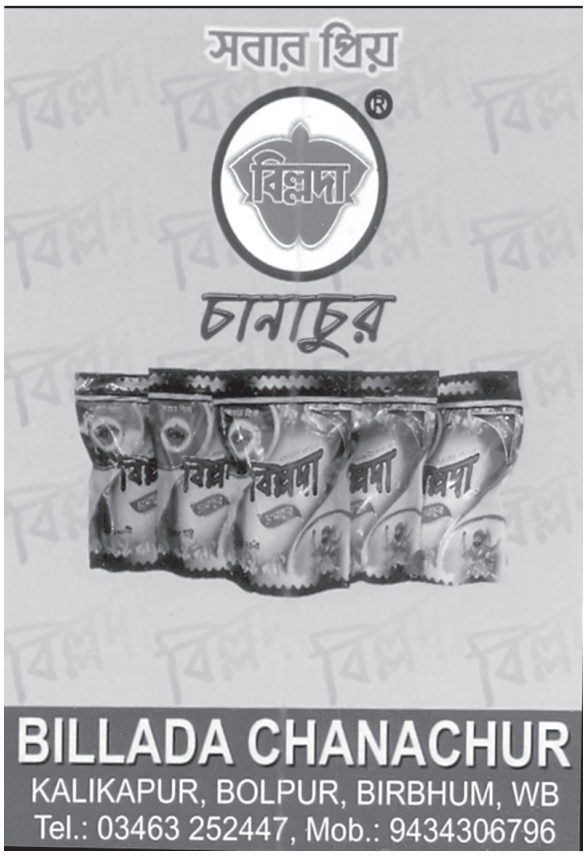
১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩



বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫



পাকিস্তানে নাবালিকা কন্যাদের করুণ আর্তনাদ কবে শেষ হবে?

আন্তর্জাতিক

রঞ্জন কুমার দে

একটা সময় ছিল যখন প্রতিটি দেশের টেলিভিশন ও বেতার শুধু সরকারি কিছু নির্দিষ্ট খবরের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। খবরের কাগজে সংবাদটি পৌঁছতে সময় লাগতো। অনেকটা পৌঁছতই না। সময়ের পট পরিবর্তনে বেসরকারি টিভি নিউজ চ্যানেলগুলি সমাজের তৃণমূল স্তরের বাস্তবতা ফুটিয়ে তুলে যথেষ্ট বাহবা কুড়িয়েছে সত্যি, কিন্তু অনেক সময় দেখা গেছে তারা কিছু নির্দিষ্ট রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় ঘেরা এবং ভুল তথ্য পরিবেশন করে সমাজকে বিভ্রান্ত করছে। বর্তমান 4G-র জমানায় সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে কোনও সত্যকে আর অপশক্তি দিয়ে চেপে রাখা সম্ভব নয়। সারা পৃথিবী যখন বসন্তের আগমনে রঙের ভুবন রাঙিয়ে তুলছে, সোশ্যাল মিডিয়ায় তখন ভাইরাল হচ্ছে এক করুণ পিতার হৃদয়বিদারক আর্তনাদ— 'আমার কন্যাদের ফিরিয়ে দাও, নয়তো পেট্রোল ঢেলে আমাকে জ্বালিয়ে দাও।' ঘটনাটি হোলির দিনে পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের। সংখ্যালঘু হিন্দু সমাজের দুই নাবালিকা বোন রিনা মেঘওয়ার (১৫) এবং রবিনা মেঘওয়ার (১৩)-কে স্থানীয় মালিক সম্প্রদায়ের মুসলমানরা অপহরণ নয়, জোর করে তুলে নিয়ে যায়। পাকিস্তানের প্রশাসন মৌলবাদী হওয়ায় অসহায়। তারা এই পিতার অভিযোগ প্রথমে নিতে চায়নি। তাই অভাগা এই পিতার আর্তনাদ ছাড়া আর কী বা করার ছিল!



দুই বোন— রিনা ও রবিনা মেঘওয়ার।

পাকিস্তানের ইংরেজি পত্রিকা ডনের এক তথ্যানুসারে সেখানে প্রতি মাসে গড়ে অন্তত ২৫ জন হিন্দু মেয়েকে বলপূর্বক ধর্মান্তরকরণ করা হয়। সম্প্রতি বালাকোটে ভারতের এয়ার স্ট্রাইকে পাকিস্তানের মোল্লারা এতোটাই ক্ষিপ্ত হয়েছে যে বিগত কয়েকদিনের ব্যবধানে অন্তত পক্ষে ৭ জন হিন্দু নাবালিকাকে বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করা হয়েছে। ফোর্সড কনভার্সন বা লাভ জিহাদ পাকিস্তানের ইসলামোফোবিকের একটা প্রধান অঙ্গ। শুধু পাকিস্তানে নয় আফগানিস্তান, বাংলাদেশ এমনকী ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এর বিষাক্ত জাল বিস্তৃত। ২০১৪ সালে পাকিস্তানে সংখ্যালঘুদের স্বার্থে কাজ করা এক সংস্থার তরফে জানানো হয় প্রতি বছর অন্তত পক্ষে এক হাজার অমুসলমান বালিকাকে ধর্মান্তরকরণ করা হয় যাদের বয়স গড়ে ১২ বছর থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। সেখানে সংখ্যালঘুদের অবস্থা এতোই করুণ যে অপহরণকারীরা এই নাবালিকা মেয়েদের ঘর থেকে বলপূর্বক অপহরণ করে নেয়। তারপর ২০-২৫ দিন আটকে রেখে করা হয় টানা বলাৎকার। এমতাবস্থায় রক্ষণশীল হিন্দু পরিবার এবং প্রতিবেশীদের কাছে এই মেয়েরা গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। ফলস্বরূপ তাদের পুরো জীবন নরক যন্ত্রণা সহ্য করা ছাড়া আর কোনও উপায় বাকি থাকে না। ২০১৬ সালের নভেম্বর মাসে স্থানীয় হিন্দু সংগঠন সংখ্যালঘু নাবালিকা মেয়েদের সুরক্ষা এবং সুবিচারের দাবিতে সংসদে আইন রূপায়ণের প্রস্তাব দেয় কিন্তু ধর্মান্ধ মৌলবাদীদের প্রবল আপত্তিতে আইনটি প্রণয়ন হওয়ার আগে মাঝপথেই ভেস্তে যায়।

পাকিস্তানে মূলত অশিক্ষা, দারিদ্র্য, অস্বাস্থ্যের শিকার সংখ্যালঘু পরিবারকে বিশেষ করে টার্গেট বানানো হয়। স্থানীয় মুসলমান জমিদাররা তাদের সংখ্যালঘু ক্ষেত মজুরদের কন্যাদের লালসার শিকার করে। এইসব বলপূর্বক ধর্মান্তরকরণের পেছনে অনেকগুলো কারণ কাজ করছে। স্থানীয় বিভিন্ন উগ্র মুসলমান সংগঠনের উস্কানিতে এই সমস্ত বর্বরতা অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ পায়। অনেক সময় নিম্নবিত্ত পরিবারের অমুসলিম বালিকাদের ভোগের আশায় যথেষ্ট পরিমাণে রেশন, অর্থ, এমনকী বাসস্থান দেওয়ার প্রলোভন দেওয়া হয়। পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশে সর্বাধিক সংখ্যালঘু হিন্দদের বসবাস। অপহরণের সিংহভাগই ঘটে প্রদেশটির হিন্দু অধ্যুষিত মিরপুরখা, থরপারকার ও উমেরকোট জেলায়। সম্প্রতি এই প্রদেশে জামায়েত উলেমা-ই-ইসলাম, জামাত-উল-দাওয়া, ফালাহ-ই-ইনসানিয়ত ফাউন্ডেশন ইত্যাদি মাদ্রাসা ভিত্তিক সংগঠনের বাড়বাড়ন্তের ফলস্বরূপ এই ধর্মান্তরকরণ। বিশেষ করে ভীল, মেঘওয়ার, কোহলি, ভাগরি প্রভৃতি তফশিলি গোষ্ঠীভুক্ত সংখ্যালঘু পরিবার এই ধর্মান্তরকরণের শিকার।

পাকিস্তানের সংখ্যালঘু সমাজের উপর

এমন অত্যাচার নতুন কিছু নয়, তাদের পাঠ্যপুস্তকে ধর্মের নামে শিশুদের কোমল মনে হিংসা ও জেহাদের বিষাক্ত বীজ বোপন করে দেওয়া হয়। US Commission On International Religious Freedom পাকিস্তানের প্রথম থেকে দশম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়ন করে ধর্মান্ধতা, সন্ত্রাসবাদীদের প্রতি সহানুভূতিশীলতা এবং অমুসলমানদের প্রতি ঘৃণার স্পষ্ট চিত্র প্রত্যক্ষ করতে পেরেছে। এই পুস্তকগুলিতে লেখা আছে হিন্দুদের সংস্কৃতি এবং সমাজ অন্যায় ও নিষ্ঠুরতার উপর প্রতিষ্ঠিত; অন্যদিকে ইসলাম শান্তি ও ভ্রাতৃত্বের বার্তা দেয়। চতুর্থ শ্রেণীর সামাজিক অধ্যয়নে লেখা মুসলমান বিরোধী শক্তি পৃথিবীতে ইসলামকে খতম করতে উঠে পড়ে লেগেছে। ইতিহাস বইয়ে বারবার সোমনাথ মন্দির আক্রমণকারী গজনিকে বীরের সম্মানে বসিয়েছে, শেখানো হয় পাকিস্তানের জন্ম হিন্দুদের বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিচ্ছবি। ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তান তথা বর্তমান বাংলাদেশের উদ্ভবের কারণ হিন্দুদের চরম চক্রান্ত। কিন্তু একবারও উল্লেখ করা হয়নি তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তান কী হারে গণধর্ষণ, হত্যা বাঙ্গালিদের উপর করেছিল। সম্প্রতি পাকিস্তানের নবম ও দশম শ্রেণীর উর্দু বইকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, কারণ বইটির একটি অধ্যায় 'পাকিস্তান কি কাহানিয়া হে' এতই বিদ্বেষপূর্ণ যে আন্তর্জাতিক চাপে পাকিস্তানকে এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করা হয়। তৃতীয় শ্রেণীর উর্দু পাঠ্যপুস্তকে লেখা 'ইসলাম বাকি সব ধর্ম থেকে শ্রেষ্ঠ'। সপ্তম শ্রেণীতে লেখা অমুসলমানদের সহানুভূতি কেবল ফায়দার জন্য দেখানো হয়। পঞ্চম শ্রেণীর ইসলামিক অধ্যয়নে লেখা 'ছাত্র হওয়ার জন্য তোমরা হয়তো ইসলামিক জেহাদে অংশগ্রহণ করতে পারছো না কিন্তু আর্থিক মদত অবশ্যই করতে পারো'। পাকিস্তানের সাধারণ শিক্ষা এমন হলে মাদ্রাসাগুলিতে কিরকম ব্রেইনওয়াশ চলছে তা সহজেই অনুমেয়। পাকিস্তান তাদের কৃতকর্মের জন্য পৃথিবীর তৃতীয়তম ধর্মীয় অসহিষ্ণু দেশ হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। বাংলাদেশেও পাকিস্তানি মডেলে জেহাদি বীজ বপন করা হয়। তাদের পঞ্চম শ্রেণীর, 'ইসলাম ধর্ম ও নৈতিকতা শিক্ষা' পাঠ্য বইয়ের ১৬ এবং ১৭ নম্বর পাতায় অমুসলমানদের মিথ্যাবাদী, সম্পদ আত্মসাৎকারী এমনকী 'পশুর চেয়েও অধম' হিসাবে শিক্ষার্থীদের কাছে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

পাকিস্তানের এই মৌলবাদী ব্রেনওয়াশের ফসল হচ্ছে তাদের জঙ্গিবাদ। নোবেলজয়ী মালালা ইউসুফজাই জঙ্গি হামলায় যথেষ্ট আন্তর্জাতিক সহানুভূতি লাভ করলেও আজ পর্যন্ত ধর্মীয় সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠতে পারেননি। সম্প্রতি নিউজিল্যান্ডের মসজিদ হামলায় সমবেদনা জানিয়ে তিনি এক টুইট বার্তায় লেখেন, 'Heartbroken for # Newzealand, Please pray for the victims and their families', তখন একজন তাঁকে পাকিস্তানে বলপূর্বক দুই হিন্দু মেয়ের ধর্মান্তকরণ নিয়ে চুপ থাকার কারণ জিজ্ঞেস করলে মালালা চরম অসৌজন্যতায় তাকে ব্লক করে দেন। নিউজিল্যান্ড এবং পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের প্রতি মানসিকতার তাঁর এত ফারাক কেন? পাকিস্তানে এর আগেও রিঙ্কল কুমারী, আসিয়া বিবিরা ঘৃণ্য ঘটনায় আন্তর্জাতিক শিরোনামে এসেছিল। এই বছরের জানুয়ারি মাসে সিন্ধু প্রদেশের রাজকুমারী তালরেজাকে সালার খান নামে এক দুষ্কৃতী গুলি করে হত্যা করে। মেয়েটির অপরাধ ছিল সে ধর্মান্তরিত হতে এবং বিয়ে করতে অসম্মতি জানিয়েছিল। পাকিস্তানে বাঁচার জন্য মুসলমান নাম রেখেও শেষ রক্ষা হয় না। ২০১৯ এর ৬ ফেব্রুয়ারি ১৩ বছরের ক্রিস্টান নাবালিকা সাদাফকে স্থানীয় মুবাসির হোসেন অপহরণ করে ধর্মান্তরিত করে। ২৪ মার্চ ২০১৯-এ আরেক নাবালিকা সোনিয়া ভিলকে জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত করা হয়। নাবালিকা রিঙ্কল কুমারী, জীবানী বাগরি, অঞ্জলি মেঘওয়ার, কিরণ কুমারী, রিনা, রুবিনা এই রকম অভাগীদের নামের তালিকা কোথায় শেষ হবে? এটাই কি পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের 'নয়া পাকিস্তানে'র উদাহরণ যেখানে তিনি সংখ্যালঘুদের সমান নাগরিকত্বের অধিকার দেওয়ার কথা বলেছিলেন? পাকিস্তানের শুধু পাঠ্যপুস্তকে নয় সেখানকার সাংসদরা মহান সংসদে দাঁড়িয়ে হিন্দুদের অপমান করতে বিন্দুমাত্র সংকোচ বোধ করেন না। ভারতের বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের উপর পাশবিকতার বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করায় অবশ্যই ধন্যবাদার্হ। কারণ এর আগে কেউ এভাবে পাক সংখ্যালঘুদের হয়ে আওয়াজ তুলেননি। সম্প্রতি ইউরোপীয়ান সংসদের ৫০ জন সদস্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে প্রেরিত এক চিঠিতে জম্মু-কাশ্মীরে পিলেট গান ব্যবহার বন্ধ করা, সুরক্ষাবাহিনীর বিশেষ অধিকার অধিনিয়ম (আফস্পা) এবং জনসুরক্ষা কানুন (পি.এস.এ) বন্ধ করার জন্য আহ্বান জানায়। কাশ্মীরে অনুচ্ছেদ ৩৭০ এবং ৩৫ (এ)-র মতো যে সুবিধা দেওয়া আছে সেটা হয়তো পৃথিবীর আর কোনও নাগরিকদের ভাগ্যে আজ পর্যন্ত জোটেনি। কিন্তু এর পরেও ইউরোপীয়ান সাংসদদের চিন্তার অন্ত নেই। এ রকম সামান্য দুশ্চিন্তা যদি কেউ পাকিস্তানের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য কিছুটা হলেও করতেন তাহলে কোনও নাবালিকার বাবার কান্না সীমান্ত পার থেকে এপারে এসে পৌঁছত না। ■

বিজ্ঞপ্তি

ডাকযোগে যাঁরা নিয়মিত স্বস্তিকা পাচ্ছেন না তাঁরা তাঁদের স্থানীয় ডাক বিভাগে এবিষয়ে লিখিত অভিযোগ করুন। এবং তাঁর এক কপি সেখানকার পোস্টমাস্টারকে দিয়ে 'রিসিভ' করান। ঐ রিসিভ কপিটি স্বস্তিকা দপ্তরে পাঠিয়ে দিন যাতে আমরা এখানে বিষয়টি জানাতে পারি।

প্রচার প্রমুখ
স্বস্তিকা

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের
মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

সুজয় চট্টোপাধ্যায়



ভারতবর্ষে মুক্ত সাংবাদিকতার জনক ছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

এক সময় ভারতে তিনজন শ্রেষ্ঠ সাংবাদিকের মধ্যে তাঁকে স্থান দেওয়া হতো। অপর দুইজন ছিলেন ট্রিবিউন পত্রিকার কালীনাথ রায় এবং লিডারের সি ওয়াই চিন্তামণি। বাঙ্গলার স্বদেশি আন্দোলনের ডাক তাঁর 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ'-এর মাধ্যমে ভারতবর্ষের ঘরে ঘরে পৌছায়। তাঁর পত্রিকায় লিখতেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে তৎকালীন বাঙ্গলা তথা ভারতবর্ষের বিখ্যাত দিকপালগণ। কিন্তু তিনি বাঙ্গালি জাতীয়তায় বিশ্বাসী হলেও কূপমণ্ডুকতায় বিশ্বাসী ছিলেন না। তাই বাঙ্গালি হিন্দুকে সর্বভারতীয় স্তরে নিয়ে যাওয়ার সাধনা তিনি আজীবন করে গেছেন তাঁর কলমের মাধ্যমে। তিনি 'The Father of Indian Journalism' রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

বর্তমানে যখন বাঙ্গালি লক্ষ্যভ্রষ্ট এবং সর্বভারতীয় স্তর থেকে বিচ্ছিন্ন একটি জাতিতে পরিণত হয়েছে, তখন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের জীবনদর্শন আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে লক্ষ্য করা যায় যে বাঙ্গলার বাইরে বসবাসকারী বাঙ্গালিরা যত বেশি জাতীয়তাবোধের চর্চা করে ও বাঙ্গালি হিন্দুর ইতিহাস ও সংস্কৃতি নিয়ে যত বেশি আগ্রহী, বাঙ্গলায় বসবাসকারী বাঙ্গালিরা তত বেশি নয়। এই প্রশ্নের উত্তর রামানন্দ সেই যুগে খুঁজেছিলেন এবং তার ফলস্বরূপ উঠে আসে 'প্রবাসী' পত্রিকা। পত্রিকার নাম থেকেই বোঝা যায় যে তিনি বাঙ্গলার বাইরে বসবাসকারী বাঙ্গালিদের নিয়ে বেশি আগ্রহী ছিলেন। পত্রিকাটি শুরু হয় বাঙ্গলার বাইরে বর্তমানে প্রয়াগ রাজে ১৩০৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখে (ইংরাজি ১৯০১ সাল)। সম্পাদক রামানন্দ আষাঢ় সংখ্যাতে একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা শুরু করার কথা ঘোষণা করেন। বিষয় ছিল চারটি, যথা, বিহারে বাঙ্গালি, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ— অযোধ্যা-পঞ্জাবে বাঙ্গালি, মধ্যভারতে বাঙ্গালি এবং ব্রহ্মদেশে বাঙ্গালি। দ্বিতীয় বিষয়ে প্রবন্ধ লেখেন জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, যিনি পরবর্তীকালে 'বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালি' (১৯১৫ সাল) গ্রন্থের লেখক হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন।

সেযুগের শ্রেষ্ঠ বাংলা পত্রিকা 'প্রবাসী'তে একটা ভারতীয়ত্বের ছাপ স্পষ্ট ছিল। রামানন্দ নিজে সচিত্র প্রবন্ধ লিখেছিলেন 'অজন্তা গুহা চিত্রাবলী' নিয়ে, যা বাংলা ভাষায় অজন্তা গুহাচিত্র নিয়ে প্রথম সামান্য প্রবন্ধ হিসাবে ধরা হয়। পত্রিকার প্রচ্ছদেও ছিল স্পষ্ট ভারতীয়ত্বের ছাপ। মঠ-মন্দির, চৈত্য-বিহার, ব্রহ্মদেশের প্যাগোডা, অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির ইত্যাদি ছবি দিয়ে কোলাজ করে ছাপা হতো প্রবাসী পত্রিকার প্রচ্ছদ। পত্রিকায় শিল্পবিভাগে থাকতো রাজা রবিবর্মা, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গগনেন্দ্রনাথ, গণপত কাশীনাথ ক্ষাত্রে, মহাদেব বিশ্বনাথ ধূরন্ধর, জাপানি শিল্পী তাইবানে-হিসিডা, ইউরোপীয় শিল্পী রাফায়েল, বিসো, হফম্যান ইত্যাদির বিশ্বখ্যাত চিত্রকলা। প্রবাসীর লেখকদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, নীরদ সি চৌধুরী, গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মুকুন্দ দাস, যোগেশ চন্দ্র বাগল প্রমুখর নাম করা যায়। বস্তুত তৎকালীন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে অনেক লেখকের লেখা প্রবন্ধ, ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক তথ্য, নাটক, উপন্যাস ইত্যাদি বাঙ্গালির ঘরে ঘরে পৌঁছায় 'প্রবাসী' পত্রিকার মাধ্যমে।

১৯০১ সাল থেকে প্রায় ৬০ বছর প্রবাসী পত্রিকা ছিল বাঙ্গলার এবং বাঙ্গলা ভাষায় প্রকাশিত অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাসিক পত্রিকা। তবে এতে ,সন্তুষ্ট থাকেননি রামানন্দ। ১৯০৭ সালে শুরু করেন 'মডার্ন রিভিউ' সর্বভারতীয় পাঠকদের জন্য। কারণ তিনি মনে করতেন যে 'আমরা প্রথমে ভারতীয়, পরে বাঙ্গালি'। এই পত্রিকার হাত ধরেই রামানন্দের নাম প্রকৃত অর্থে সর্বভারতীয় স্তরে পৌঁছায়। পত্রিকার প্রভাব এতটাই ছিল যে তৎকালীন ব্রিটিশ গোয়েন্দা এবং শাসনকর্তারা এটি নিয়মিত পড়তেন 'ভারতীয় জাতীয়তাবাদী' আন্দোলন কোন দিকে যাচ্ছে তা জানার জন্য। এটি কোনো রাজনৈতিক দলের বা গোষ্ঠীর বা মতাদর্শের মুখপত্র ছিল না। সকল রাজনৈতিক দলের

সকল ব্যক্তি এতে লিখতে পারতেন। স্বামী নিগমানন্দের 'ঠাকুরের চিঠি' থেকে ভেরিয়ার এলউইনের গোন্ড জাতিকে নিয়ে লেখা প্রবন্ধ— এই পত্রিকার ক্ষেত্র ছিল বিশাল ও অবাধ। এই এলউইন পরবর্তীকালে তাঁর মিশনারির চাকরি ছেড়ে গান্ধীজীর সংস্পর্শে আসেন ও ১৯৩৫ সালে হিন্দুধর্মে দীক্ষা নেন। রামানন্দের এই দীর্ঘ যাত্রা প্রথমে সহজ ছিল না। ১৮৬৫ সালের ২৯ মে বাঁকুড়ার পাঠকপাড়ার এক অখ্যাত গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কিশোর বয়সে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতার প্রতি আকৃষ্ট হন। ১৮৮৩ সালে বাঁকুড়া জেলা স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করে উচ্চশিক্ষার জন্য কলিকাতা আসেন। ১৮৮৫ সালে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে এফ.এ. পরীক্ষা পাশ করে সিটি কলেজে ভর্তি হন। ১৮৮৮ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ.-তে 'ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট' হিসাবে উত্তীর্ণ হন। মাসিক ৫০ টাকা রিপন স্কলারশিপ তিনি লাভ করেন। তাঁর প্রথম সাংবাদিকতায় হাতেখড়ি হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের মাধ্যমে, 'ইন্ডিয়ান মেসেঞ্জার' পত্রিকায়, যা সেই সময় সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের মুখপত্র ছিল। রামানন্দ এই পত্রিকার সহ-সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৮৭০ সালে রামানন্দ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে এম.এ. পাশ করেন। ঠিক ৩ বছর পরে তিনি সিটি কলেজে অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেন। এই সময় আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসুর সঙ্গে তাঁর সখ্য গড়ে ওঠে এবং তিনি, শিবনাথ শাস্ত্রী এবং জগদীশ চন্দ্র শিশুপাঠ্য 'মুকুল' পত্রিকাটি শুরু করেন। ১৮৯৫ সালে রামানন্দ এলাহাবাদ কায়স্থ পাঠশালাতে শিক্ষকের চাকরি পেয়ে এলাহাবাদে আসেন। এই সময় তাঁর জীবনে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। তিনি বাঙ্গালিদের জন্য একটি পত্রিকা প্রকাশ করার কথা ভাবছিলেন। ফলস্বরূপ ১৮৯৭ সালে তিনি 'প্রদীপ' ম্যাগাজিনের চিফ এডিটরের দায়িত্ব নেন, কিন্তু মতবিরোধের কারণে এটি ছেড়ে ১৯০১ সালে শুরু করেন 'প্রবাসী'। চিন্তামণি ঘোষ, এলাহাবাদে ইন্ডিয়ান প্রেসের মালিক তাঁকে 'প্রবাসী' প্রকাশ করতে সাহায্য করেন। এরপর ১৯০৭ সালে শুরু হয় 'মডার্ন রিভিউ'। দু' বছরের মধ্যে ব্রিটিশ সরকার রামানন্দকে এলাহাবাদ ত্যাগ করতে নির্দেশ দেয়। কারণ তাঁর পত্রিকা স্বদেশি আদর্শ প্রচার করছিল। যাইহোক, কলিকাতায় ফিরে আসার পর থেকে আমৃত্যু তিনি তার দুটি পত্রিকা নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। ১৯৪৩ সালে মৃত্যুর আগে অবধি রামানন্দ ছিলেন সাংবাদিকতার জগতে নতুন চিন্তাধারার জনক---সে নারী স্বাধীনতাই হোক বা বিজ্ঞানমনস্কতা। সেযুগে তাঁর চিন্তাধারা বর্তমানে সময়কেও লজ্জা দেয়।

২০১৬ সালে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের ১৫০তম জন্মবর্ষ পালিত হয় এবং তার পত্রিকায় প্রকাশিত বিখ্যাত ব্যক্তির ও লেখকদের লেখা নিয়ে একটি সংকলন প্রকাশিত হয়। সেইসব ব্যক্তিত্ব ও লেখকদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নেহরু, সুভাষচন্দ্র বোস, এম. কে. গান্ধী, সি.এফ. এন্ড্রুজ, ভেরিয়ার এলউইন, মুন্সী প্রেমচাঁদ, রোঁমা রোঁলা, লালা লাজপত রায়, সিস্টার নিবেদিতা ও ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারের নাম করা যায়। সংকলনটি নাম 'Patriots, poets and Prirouers'। এটির দায়িত্ব নিয়েছিলেন রামানন্দের বংশধরেরা--- অনিকেন্দ্র সেন, দেবাংশু দত্ত, ও নীলাঞ্জনা রায়। এর ভূমিকা লিখেছিলেন রামচন্দ্র গুহ। কিন্তু ইন্টেলেকচুয়াল ও সাংবাদিক তার জগতের বাইরে রামানন্দের প্রকৃত মূল্যায়ন এখনও হয়নি। বোধহয় তাকে সবচেয়ে কাছাকাছি দেখে তাঁর প্রকৃত প্রতিভা ও গুরুত্ব বুঝেছিলেন একমাত্র নীরদ সি. চৌধুরী, যিনি রামানন্দের মডার্ন রিভিউয়ের সহ-সম্পাদক ছিলেন। নীরদ সি. চৌধুরী লিখেছেন যে রামানন্দকে দেখে অনেকে রেঁনেসার ছবির দাড়িওয়ালা সেন্ট পিটার্স বলে ভুল করতেন এবং তাকে জেনেভার League of Nations-এর General Assembly-এর সেশনে অনেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেও ভুল করেছিল। ব্যক্তি রামানন্দ ছিলেন প্রকৃত অর্থেই সেন্ট পিটার্স-এর মতো জ্ঞানী, শান্ত ও নীরব ব্যক্তি। অযথা ঢাক পেটানোর মানসিকতা থেকে মুক্ত ছিলেন তিনি। প্রবাসী পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় তিনি লিখেছিলেন— ''প্রারম্ভের আড়ম্বর অপেক্ষা ফল দ্বারাই কাব্যের বিচার হওয়া ভালো। এইজন্য আমরা আপাতত আমাদের আশা ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নীরব রহিলাম।''

২০১৫ সালের ২৯ মে আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল 'রামানন্দের বাস্তুভিটে ফিরে চায় বাঁকুড়া'। সেদিন রামানন্দের সার্ধশতবর্ষ পূর্ণ হয়। তার বসতবাড়ি ভেঙে জমি বিক্রির ঘটনা ছাপা হয়েছিল সেই রিপোর্টে। আজ এত বছর পরেও বাঙ্গালি তথা ভারতবর্ষ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতি সুবিচার করতে পারেনি। যে জাতির বোঝা মাথায় নিয়ে যিনি কলম ধরেছিলেন, সে জাতির কাছে তিনি প্রায় বিস্মৃত।

তাঁর প্রবাসী এবং মডার্ন রিভিউ-এর স্থান হয়েছে ইতিহাসের পাতায়। প্রকৃত অর্থে কোনো বাঙ্গলা পত্রিকা বা ম্যাগাজিন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের উত্তরাধিকারী হয়ে উঠতে পারেনি। ■

একটাই Bank Account-এর মাধ্যমে
সারা জীবনের মত সমাধান

Smart Online Account খুলুন, নিজেকে এগিয়ে নিয়ে চলুন

আজই খুলুন আপনার ICICI Bank এর

3 in 1 Account

(TRADING, DEMAT & SAVINGS)

- Online Savings Bank A/C পরিষেবা।
- Trading A/C & Demat A/C
- Online Equity, Mutual Fund, PPF, Bond, FD ইত্যাদি সমস্তরকম Financial Product কেনা-বেচা বাড়িতে বসেই করতে পারবেন।
- বার বার Form Fillup করার বা Signature করার প্রয়োজন নেই।
- Maturity-র সময় Signature না মেলার (Missmatch) কোন ঝঞ্ঝাট নেই।
- এককথায় ইনভেস্টমেন্ট এখন আপনার হাতে মুঠোয়। আর Bank আপনার পকেটে।

ICICI Securities
Nurturing Profitable Partnerships

DRS INVESTMENT
Mutual Fund | Insurance | Fixed Deposit | Bond
Find us on Facebook
Contact : 98303 72090 / 97489 78406
E-mail : drsinvestment@gmail.com

জালিয়ানওয়ালাবাগে হুগলির ষষ্ঠীচরণ

অন্য রকম

নিজস্ব প্রতিনিধি॥

জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ তার নাইটহুড উপাধি ত্যাগ করেছিলেন। ব্রিটিশ সরকারের দেওয়া এই উপাধিকে বর্ণনা করেছিলেন 'বোঝাস্বরূপ' বলে। এই একটি ঘটনা বলে দেয় জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড সেই যুগের জনমানসে কী সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল।

বস্তুত, ভারতবর্ষের ইতিহাসে এমন অনেক তারিখে রয়েছে যার প্রেক্ষাপটে রয়ে গেছে কোনও না কোনও ভয়ংকর ঘটনা। এমনই একটি তারিখ, ১৩ এপ্রিল ১৯১৯। এই দিন সভ্যতার কলঙ্কস্বরূপ এক ব্রিটিশ অফিসারের নির্দেশে পঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে সহস্রাধিক নিরীহ মানুষকে হত্যা করা হয়। এ বছর জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের শতবর্ষপূর্তি।

১৩ এপ্রিল ১৯১৯ তারিখে মহাত্মা গান্ধীর পথ অনুসরণ করে প্রায় ৫০০০ মানুষ জালিয়ানওয়ালাবাগে সমবেত হয়েছিলেন কুখ্যাত রাউলাট আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে। রাউলাট আইনের সাহায্যে ব্রিটিশ পুলিশ কোনওরকম তথ্যপ্রমাণ ছাড়াই যে কোনও ভারতীয়কে আটক করতে পারত। আটক করার পর শুরু হতো অত্যাচার। দিনের পর দিন পুলিশি অত্যাচারের ফলে বহু লোক মারা যেতেন।

এমনই এক অমানবিক আইনের বিরুদ্ধে সংগঠিত হয়েছিল প্রতিবাদ। জালিয়ানওয়ালাবাগ জায়গাটা এমনিতে ছোটো। চারপাশে ঘিঞ্জি বাড়িঘর। ছোটো ছোটো গলি। প্রতিবাদস্থলে ঢোকবার বা বেরোবার রাস্তা একটাই। প্রতিবাদ যখন জমে উঠেছে, ঠিক তখনই জালিয়ানওয়ালাবাগে ঢুকলেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডায়ার। বেরোবার রাস্তা বন্ধ করে দিল পুলিশ। ডায়ার হুকুম দিলেন, গুলি চালাও। সেদিন ১৬৫০ রাউন্ড গুলি চালানো হয়েছিল। মারা



সুকুমার মুখোপাধ্যায়

গিয়েছিলেন ১৫০০ জন নিরীহ মানুষ।

সেদিন প্রতিবাদকারীদের মধ্যে ছিলেন এক বাঙ্গালি ডাক্তার। হুগলির ষষ্ঠীচরণ মুখোপাধ্যায়। মদনমোহন মালব্যর রাজনৈতিক শিষ্য এই মানুষটি অবিভক্ত বাংলাদেশ থেকে ভাগ্যান্বেষণে বেরিয়ে প্রথমে স্থিতু হন এলাহাবাদে। তারপর পঞ্জাবে। সেদিন যখন গুলি চলছিল তখন তিনি মঞ্চের নীচে আশ্রয় নিয়ে প্রাণ বাঁচান। পরে মদনমোহন মালব্যেরই নির্দেশে সারা ভারতবর্ষের ক্ষতচিহ্নস্বরূপ জালিয়ানওয়ালাবাগের রক্ষণাবেক্ষণে নিজের জীবন উৎসর্গ করেন।

বর্তমানে ষষ্ঠীচরণের বংশধরেরা তুলে নিয়েছেন জালিয়ানওয়ালাবাগের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব। তাঁর পৌত্র সুকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন, 'ব্রিটিশ পুলিশের নৃশংসতায় মর্মাহত ষষ্ঠীচরণ জালিওয়ানওয়ালাবাগের জমি অধিগ্রহণ করার জন্য জাতীয় কংগ্রেসকে প্রস্তাব দেন। কারণ তিনি বুঝেছিলেন এই জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের দেশের মানুষের মনে গভীরতম যন্ত্রণার স্মৃতি হয়ে বেঁচে থাকবে।

ব্রিটিশ পুলিশ হত্যাকাণ্ডের সব তথ্যপ্রমাণ নষ্ট করার জন্য জালিয়ানওয়ালাবাগে জামাকাপড়ের বাজার তৈরি করতে চেয়েছিল। ওদিকে জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাবে কংগ্রেস কোনও সাড়াশব্দ করছে না দেখে ষষ্ঠীচরণ তার পরিকল্পনা বদলালেন। এবার আর কংগ্রেসের অন্য কোনও নেতাকে নয়, খোদ গান্ধীজীকে জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব দিয়ে বললেন, 'জালিয়ানওয়ালাবাগে এখনই জাতীয় স্মারক তৈরি করা প্রয়োজন।' গান্ধীজীর নির্দেশে পিটিশন দাখিল করা হলো। জমির মূল্য নির্ধারিত হলো ৫.৬৫ লক্ষ টাকা। দেশের সাধারণ মানুষকে সাধ্যমতো অর্থদান করার জন্য অনুরোধ করলেন গান্ধীজী। আর ষষ্ঠীচরণ মানুষের দরজায় দরজায় ঘুরে সংগ্রহ করলেন অর্থ। বিমুখ করেনি দেশ। নয় লক্ষ টাকা সংগৃহীত হয়েছিল। এই টাকায় জমি অধিগ্রহণ করা হয়। গড়ে ওঠে স্মারক।

ষষ্ঠীচরণের পৌত্র সুকুমার মুখোপাধ্যায়ও দাদুর মতো যত্নে আর মমতায় আগলে রেখেছেন জালিয়ানওয়ালাবাগকে। তিনি বলেন, '১৯৭৮ সালে আমি বাবার সঙ্গে কাজ করতে শুরু করি। বাবা ১৯৮৮ সালে মারা যান। কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যে জালিয়ানওয়ালাবাগ ট্রাস্ট সেদিনের হতভাগ্য মানুষগুলোর স্মৃতি রক্ষার কাজ করে চলেছে।'

স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙ্গালি ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু ষষ্ঠীচরণ যা করেছেন বা সুকুমারবাবুরা যা করছেন তা সম্পূর্ণতই অন্যরকম। সেদিন ষষ্ঠীচরণ এগিয়ে না এলে ভারতের জাতীয় ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হারিয়ে যেত। সব থেকে বড়ো কথা, ব্রিটিশের হিংস্র মুখের ছবি ভারতের বাইরের মানুষ দেখতেই পেতেন না।

মহাপ্রাণ মধুর মিত্র বানর

বানর বা বাঁদরকে বলা হয় মনুষ্যেতর প্রাণী। এদের দৈহিক গঠন ও প্রকৃতি আদিম মানুষের খুব কাছাকাছি। বড্ড মিষ্টি রকম সকম এদের। বনে-জঙ্গলে, বিভিন্ন শহরে ছাড়াও প্রায় সমস্ত তীর্থক্ষেত্রে এদের দেখা মেলে। ধর্মীয় কারণে মানুষ এদের কোনও রকম উৎপীড়ন করে না, বরং পুণ্য অর্জনের অভিলাষে তীর্থক্ষেত্রে আগত ভক্তরা এদের নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য প্রদান করেন। বলা ভালো, বানররা এমনই মিষ্টি প্রাণী যে ভালোবাসা, খাবারদাবার এরা নিজগুণেই আদায় করে নেয়। উপনিষদে বলা হয়েছে, 'ব্রহ্মার চোখ বানরের মতো চঞ্চল। চারিদিকে নজর'। ঈশ্বরের চোখ কি স্থির থাকলে চলে? আচার্য বিনোবা ভাবে বলেছেন, ' আপনি-আমি ধ্যানস্থ হলে ক্ষতি নেই, কিন্তু ঈশ্বর ধ্যানে বসলে উপায়? তাই ঋষিরা বানরের মধ্যে সকলের কল্যাণকামী ব্রহ্মার দৃষ্টি দেখেন। বানরে পরমাত্মা দেখতে শিখুন।'

বানর মানব-সদৃশ স্তন্যপায়ী প্রাণী। বিজ্ঞানের পরিভাষায় বলে —অ্যানথ্রোপয়েডস্। এরা সমাজবদ্ধ জীব। অত্যন্ত শৃঙ্খলাপরায়ণ। নানা বয়সের সদস্যরা একসঙ্গে থাকে। একে অন্যকে সাহায্য করে। মা ও সন্তান, স্বামী ও স্ত্রী একে অন্যের শরীরের লোমে বিলি কেটে দেয়। উকুন বেছে খেয়েও নেয়। ধুলো-ময়লা ঝেড়ে নিজেদের পরিষ্কার রাখে। মা ও সন্তানের ভালোবাসা তুলনাহীন। অদ্ভুত সুন্দর এক ছবি।

নানা প্রজাতির বানর আছে। **লালমুখো বানর** ঃ এরা মোটাসোটা ও ওজনে ভারী হয়। এরা ভালো সাঁতার কাটতে পারে। **বানর (বনেট ম্যাকাক)** ঃ এদেরই সাধারণত আমরা দেখে থাকি। **অসমিয়া বানর** ঃ এই প্রজাতির বানর



হিমালয় ও সুন্দরবন এলাকায় দেখা যায়। **সিংহপুচ্ছ বানর** ঃ এদের দেখা মেলে পশ্চিমঘাট পর্বতমালা থেকে কন্যাকুমারী। **কাপুচিন বানর** ঃ এরা মানুষের হাত থেকে কোনও কিছু গ্রহণ করে না। **কমন মারমোসেট** ঃ ব্রাজিলের উত্তর উপকূলে এদের বাস। **বারবারি বানর** ঃ জিব্রাল্টার, উত্তর আফ্রিকার মরক্কো, আলজিয়ার্সে এদের দেখতে পাওয়া যায়। **লম্বালেকো বানর** ঃ মালেশিয়া ও ইন্দোনশিয়াতে এদের দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়াও দেখা মেলে **তুষার বানরের**। জাপানে এদের দেখতে পাওয়া যায়। এরা অত্যন্ত হিংস্র ও মাংসাশী। রয়েছে **শুয়োর লেজা বানর, সোনালি বানর**।

সমস্ত প্রজাতির বানরই কম-বেশি আবেগপ্রবণ। এরা মানুষের মতোই সংবেদনশীল। মানুষের থেকে অনেক বেশি পরোপকারী। জঙ্গলে বা লোকালয়ে এরা অনেক সময় অযাচিত সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। সুন্দরবনে মউলিরা যখন মৌচাকের সন্ধানে যায় তখন এরা 'কু' শব্দ করে ডেকে অন্যদের জানিয়ে দেয়। যেখানে বানর থাকে সেখানে নাকি বাঘ আসে না। বাচ্চা জন্মানোর পর শিশু তার মায়ের বুকে আঁকড়ে ধরে থাকে। বাচ্চা একটু বড়ো হলে মা খাবারের খোঁজে কোথাও গেলে দলের অন্য মেয়ে-বানররা বাচ্চাকে সামলায়। মায়ের অনেক কাজ। বাচ্চাকে দুধ দেওয়া ছাড়া বাচ্চার চোখ-মুখ পরিষ্কার করে দেওয়া, গায়ের পোকা বেছে দেওয়া ইত্যাদি। বাচ্চাকে সীমাহীন আদর যেমন দেয় মা, তেমনি বাচ্চা বেয়াড়াপনা করলে চড়চাপড় মেরে শাসন করতেও দেখা যায়। শিশুটি কিছুটা বড়ো হলে মা তখন বুকে না নিয়ে পিঠে চাপিয়ে অতি সহজেই এক গাছ থেকে অন্য গাছে লাফালাফি করতে থাকে খাবারের খোঁজে। শিশুরা বারো থেকে পনেরো মাস পর্যন্ত মায়ের দুধ খায়। সব বানরই কলা খেতে ভালোবাসে। এদের দাঁতের সংখ্যা বত্রিশটি।

আফ্রিকার জঙ্গলে সৌম্যকান্তি এক প্রজাতির বানর আবিষ্কৃত হয়েছে। এদের চোখ যোগীর মতো। স্থানীয় মানুষ আদর করে নাম দিয়েছে লেসুলা, বাংলায় যার অর্থ হলো গুরুমশাই। প্রাণী বিজ্ঞানীরা পেঁচার সঙ্গে চেহারাগত মিল পেয়ে নাম দিয়েছে আউল মাংকি। এই বানররা এত বছর কঙ্গোর অরণ্যে লুকিয়েই ছিল। এদের দেখে মনে হয় যেন ধ্যানস্থ ঋষি।

তাপস অধিকারী

ভারতের পথে পথে

মধেরা



উত্তর গুজরাটের অন্যতম দর্শনীয় স্থান মধেরা। অষ্টম শতকে সোলাঙ্কি রাজা প্রথম ভীমদেবের আমলে তৈরি সূর্য মন্দিরটি শিল্পসুষমা মণ্ডিত ভাস্কর্যে অনবদ্য। অপূর্ব কারুকাযমণ্ডিত তোরণদ্বার পেরিয়ে সভামণ্ডপ। মণ্ডপ শেষে মূল মন্দির। মুল মন্দিরটি অবশ্য গজনির সুলতান মামুদের আক্রমণ এবং ভূমিকম্পে ধ্বংস হয়ে যায়। নাগরীশৈলীতে বিশেষ জ্যামিতিক ছকে তৈরি করা হয়েছিল। তখন উদিত সূর্যের কিরণ সরাসরি বিগ্রহের ওপর পড়ত। সেকালের মূল বিগ্রহটি আর নেই। পরে তৈরি হওয়া মন্দির প্রাসাদের ভিতর দেওয়ালের ১২ টি কুলুঙ্গিতে মাসভেদে রূপান্তরিত ১২ টি সূর্যদেবতার মূর্তি রয়েছে। মন্দিরের সামনে সূর্যকুণ্ডকে ঘিরে ১০৮ টি ছোটো মন্দির রয়েছে। মন্দিরের পিছন দিয়ে বয়ে চলেছে পুষ্পবতী নদী। একটু দূরেই রয়েছে বেচারাজী দুর্গা মন্দির।

জানো কি?

- বাংলা উপন্যাসের জনক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
- বাংলা সনেটের জনক মাইকেল মধুসূদন দত্ত।
- বাংলা গদ্য সাহিত্যের জনক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।
- বাংলা ছোটো গল্প ও গদ্য ছন্দের জনক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- আধুনিক বাংলা কবিতার জনক জীবনানন্দ দাশ।
- বাংলা মুক্ত ছন্দের জনক কাজী নজরুল ইসলাম।
- চলিত ভাষায় গদ্যের জনক প্রমথ চৌধুরী।।

ভালো কথা

তুলসীগাছে জল

বোশেখ মাস পড়তেই আমাদের উঠোনের দক্ষিণ কোণে তুলসীবেদীর ওপর দাদু একটা মাটির হাঁড়ির তলায় ফুটো করে ঝুলিয়ে দেয়। স্নান করে বাবা, জেঠু ও দাদু, মা জেঠিমা ও ঠাকুমা হাঁড়িতে জল দিলে ফোঁটা ফোঁটা জল তুলসীগাছের গোড়ায় পড়তে থাকে। ক'দিনের মধ্যেই তুলসীগাছটা সতেজ হয়ে ওঠে। আমি সেদিন দাদুকে জিজ্ঞেস করলাম বোশেখ মাসেই শুধু তুলসীগাছে জল দিতে হয় কেন? দাদু বলল এর দুটো কারণ আছে। এক, বোশেখ মাসে সূর্যের তাপে তাড়াতাড়ি মাটির রস শুকিয়ে যায়। বেদীতে মাটি খুব কম থাকে। তুলসীগাছ মরে যেতে পারে। তুলসীগাছ বাড়িতে থাকা খুব দরকার। বাড়ির পরিবেশ শুদ্ধ থাকে। দুই, এসময় বহু পিঁপড়ে তেষ্টায় জল না পেয়ে মারা যায়। এই এক মাস ওরা এখান থেকেই তেষ্টা মেটায়।

আকাশ দাস, অষ্টম শ্রেণী, জয়পুর, পুরুলিয়া।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

ছোটদের কলমে

পদ্মপুকুর

রংগন মণ্ডল, অষ্টম শ্রেণী, বসিরহাট।

পাহাড়পুরের পদ্মপুকুর
অপূর্ব তার শোভা,
রাজহংস ভেসে চলে
জলে আধো ডোবা।
উৎসর্গিত পুকুরখানি
স্বচ্ছ তার জল,
সেই জলেতে সাঁতার কাটে
দামাল ছেলের দল।

পুকুর পাড়ে সারি সারি
সবুজ সবুজ গাছ,
জলের 'পরে খেলে বেড়ায়
নানান জাতের মাছ।
গ্রামের মানুষ নাইতে আসে
দুপুর বেলাতে,
গোরু-ছাগল ভেড়াও আসে
তৃষ্ণা মেটাতে।

এই বিভাগে ছোটরা কবিতা লিখে পাঠাও

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584
E-mail : swastika5915@gmail.com
ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

।। চিত্রকথা।। পরীক্ষিৎ।। ১৯।।



নোটায় ভোট দেশগঠনের পরিপন্থী

দেবযানী ভট্টাচার্য

সাম্প্রতিক অতীতে ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে নানা দলের রাজনৈতিক লড়াইয়ের পাশাপাশি আর একটি সমান্তরাল প্রচার দৃষ্টি ও শ্রুতিগোচর হচ্ছে। জনগণকে সমস্ত রাজনৈতিক দলকে বর্জন করে নোটাতে ভোট দিতে বলা হচ্ছে। কিন্তু কেন?

শুরুতেই বলা প্রয়োজন যে পশ্চিমবঙ্গে যেভাবে নির্বাচন হয়, ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের নির্বাচনী পরিস্থিতি ঠিক সেরকম নয়। পশ্চিমবঙ্গের ভোটারেরা সবসময় রুলিং পার্টির নজরবন্দি থাকে এবং রুলিং পার্টির লোকেরা চিহ্নিত করে ফেলে যে, কোন বাড়ি থেকে কে বা কারা বিরোধী প্রার্থীকে ভোট দিতে পারে। ভোটের আগে ও পরে তাদেরকে হুমকি, মার, খুন ইত্যাদি করা হয়ে থাকে। বামফ্রন্টের আমলেও এসব হতো; মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও সেই রাজনৈতিক সংস্কৃতিই অধিগ্রহণ করেছেন। ইদানীং আমরা সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে দেখতে ও শুনতে পাচ্ছি যে তৃণমূলের নেতারা কীভাবে প্রকাশ্য জনসভায় মানুষকে হুমকি দিচ্ছেন যে ভোটের পর প্রতিবাদীদের ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে বুঝে নেওয়া হবে!

এখানকার বহুসংখ্যক সাধারণ মানুষ অনেক সময়ই রাজনৈতিক দলের চাপে ভোট দিতে যাওয়া থেকে বিরত হতে বাধ্য হন। হয় ভোট দিতে পারেন না, নয়তো যাকে ভোট দিতে বলা হয় বা জোর করা হয়, তাকেই ভোট দেন। যদিও ইদানীং পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রামের লোক ভোটের বাক্সে প্রতিবাদ করার একটা গণতান্ত্রিক সাহস দেখাতে শুরু করেছেন।

অন্যান্য রাজ্যগুলির চিত্র পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে পৃথক। পশ্চিমবঙ্গের মতো এমন সর্বব্যাপী মানসিক সন্ত্রাস অন্য রাজ্যগুলোতে নেই। তাই নোটা-ইস্যুর গুরুত্ব অন্যান্য রাজ্যের জন্য যতটা, পশ্চিমবঙ্গের জন্য হয়তো তার চেয়ে কিছু কম।

তবুও তা একেবারে অগ্রাহ্য করার মতো নয়। দেখে নেওয়া যাক্ পশ্চিমবঙ্গের নোটা-চিত্রটি ঠিক কেমন।

নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে মোট ভোট পড়েছিল ৪,৪৬,৯৭,৭৯১টি এবং তার ১.৫২ শতাংশ অর্থাৎ ৮,৩২,১৪৮টি পড়েছিল নোটাতে। অর্থাৎ রাজ্যের ২৯৪টি বিধানসভা আসনের

দেশকাল

প্রত্যেকটিতে গড়ে ২৮৩০টির মতন ভোট নোটায় পড়েছিল। সংখ্যার বিচারে পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে বেশি নোটা ভোট পড়েছে এমন দশটি বিধানসভা কেন্দ্র (মানের নিম্নক্রমে, অর্থাৎ বেশি থেকে কম, এই ক্রমানুসারে) এইরকম—

১. ছাতনা, ২. কার্শিয়াং, ৩. নাগরাকাটা, ৪. কুমারগ্রাম, ৫. দার্জিলিং, ৬. চুঁচুড়া, ৭. বিনপুর, ৮. রঘুনাথপুর, ৯. মাদারিহাট, ১০. সোনামুখী।

নোটা-প্রচারকারীরা চাইছেন দেশের সাধারণ জনগণ মনের শান্তির জন্য ভোট দিক কিন্তু দেশগঠনে তাদের ভোটের কোনো ভূমিকা না থাকুক। কিন্তু সাধারণ নিরপেক্ষ ভোটারের কর্তব্য হলো দেশ গঠনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করা। ভোট দেওয়া তাঁদের অধিকার শুধু নয়, কর্তব্যও।

আর সবচেয়ে কমসংখ্যক নোটা ভোট পড়েছে যেসব বিধানসভা কেন্দ্রগুলিতে সেগুলি (মানের ঊর্ধ্বক্রমে, অর্থাৎ সবচেয়ে কম থেকে ক্রমান্বয়ে বেশি, এই অর্ডারে) এইরকম—

১. হাওড়া উত্তর (নোটা ভোট পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সবচেয়ে কম পড়েছে এই কেন্দ্রে), ২. পটাশপুর, ৩. কাকদ্বীপ, ৪. ভগবানপুর, ৫. হরিহরপাড়া, ৬. ময়না, ৭. নন্দীগ্রাম, ৮. কুলপি, ৯. বাগদা, ১০. পাথরপ্রতিমা।

ভোটের শতাংশের বিচারে নোটার সর্বাধিক শতাংশ কার্শিয়াং বিধানসভা কেন্দ্রে, ৪.৫৩ শতাংশ। কিন্তু মোট সংখ্যার বিচারে সবচেয়ে বেশি নোটা ভোট পড়েছে বাঁকুড়ার ছাতনাতে, ৭৭০৯টি, শতাংশের বিচারে ৪.৩১ শতাংশ।

আর একটি উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ হলো, যে যে কেন্দ্রে ৯০ শতাংশের বেশি ভোট পড়েছে, তার প্রায় কোথাওই নোটা ভোটের পার্সেন্টেজ রাজ্যের নোটা ভোটের গড় পার্সেন্টেজ, ১.৫২ শতাংশকে ছাড়ায়নি। অপরপক্ষে, যে সমস্ত কেন্দ্রে নোটা ভোটের পার্সেন্টেজ ১.৯ শতাংশের বেশি, অর্থাৎ গোটা রাজ্যের নোটার গড় পার্সেন্টেজের থেকে বেশি হয়েছে, তার কোথাওই মোট কাস্টেড ভোটের পার্সেন্টেজ ৯০ শতাংশ হয়নি।

কলকাতার মধ্যে সংখ্যার বিচারে সবচেয়ে বেশি নোটা ভোট পড়েছে বেহালা পশ্চিম কেন্দ্রে, ৪,১৩৭টি ও বেহালা পূর্ব কেন্দ্রে, ৩,৯১৯ টি। যদিও পার্সেন্টেজের বিচারে কলকাতার মধ্যে সর্বাধিক নোটা ভোট পড়েছে রাসবিহারী কেন্দ্রে। শতাংশের বিচারে ২.৮১ শতাংশ যেখানে নোটা ভোটের সংখ্যা হলো ৩,৮৭২।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, হঠাৎ এই নোটাতে

ফঃ ৬

ভোট দেওয়ার বিষয়টা আজ এত বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে কেন? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে আগে একবার দেখে নেওয়া প্রয়োজন নোটার তাৎপর্য। নোটা অর্থাৎ নান অব দ্য অ্যাবাভ। অর্থাৎ যিনি নোটাতে ভোট দিচ্ছেন, তিনি উক্ত কেন্দ্রের প্রার্থীদের কাউকেই তাঁর নিজের প্রতিনিধি হিসেবে যোগ্য মনে করতে পারছেন না বলেই নোটাতে ভোট দিচ্ছেন। ২০০৯ সালে নির্বাচন কমিশন এমন ভোটারদের কথা ভেবেই নোটা আইনের প্রভিশন প্রথমবার আনতে চায়। তৎকালীন কংগ্রেস সরকার তার বিরোধিতা করেছিল, কিন্তু ২০১৩ সালে সুপ্রিম কোর্টের রায়ে নোটা আইন কার্যকর হয়।

কিন্তু ওই পর্যন্তই। নোটা ভোটের অন্য কোনো গুরুত্ব নেই। নোটা ভোটার তাঁর ভোটের মাধ্যমে দেশের সরকার গঠনে ইতিবাচক বা নেতিবাচক, কোনো ভূমিকাই পালন করতে পারবেন না। মনে করুন, কোনো কেন্দ্রে যদি ১০০ জন ভোটার ভোট দিয়ে থাকে এবং তার মধ্যে ৮০ জনও যদি নোটাতে ভোট দেয় তাহলেও বাকি ২০ জনের ভোটের ভিত্তিতেই উক্ত কেন্দ্রের সমস্ত প্রার্থীদের মধ্যে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে প্রার্থী নির্বাচিত হবে। অর্থাৎ ওই ৮০টা ভোট কেবলমাত্র অগ্রাহ্যই করা হবে। বাকি ২০টি ভোটের মধ্যে যে প্রার্থী সবচেয়ে বেশি ভোট পাবে, সেই হবে ওই কেন্দ্রের নির্বাচিত প্রার্থী। অর্থাৎ কোনো কেন্দ্রের অধিকাংশ নির্বাচক ভোটারও যদি ওই কেন্দ্রের কোনো দলের কোনো প্রার্থীকেই পছন্দ না করে এবং নোটাতে ভোট দেয়, অর্থাৎ ওই কেন্দ্রে যদি নোটা ভোটে জেতে, তাহলেও এমন হবে না যে ওই কেন্দ্রে ভোটই পরিত্যক্ত হলো। নতুন প্রার্থীতালিকা তৈরি করে ওই কেন্দ্রে যে আবার নতুন করে নির্বাচন হবে, তা কিন্তু নয়। নোটাতে পড়া ভোটগুলি অগ্রাহ্য করা হবে এবং বাকি ২০টি ভোটের ভিত্তিতেই ওই কেন্দ্রের ভোটের ফলাফল ঘোষিত হবে। নোটা আইনের প্রভিশন তাই। অর্থাৎ নোটা একটি নখদন্তহীন, অপদার্থ আইন। আরও স্পষ্ট ভাবে বলতে গেলে যে অধিকার মানুষের স্বতঃসিদ্ধ অর্থাৎ ভোট না নিয়ে থাকার অধিকার, নোটা আইন শুধু সেই অধিকারকে আইনত মান্যতা দেয় মাত্র। অর্থাৎ কারুর ভোট যাতে বেআইনিভাবে অন্য কেউ দিয়ে যেতে না পারে, নোটাতে ভোট দিয়ে শুধু সেটুকুই নিশ্চিত করা যায় মাত্র। নোটাতে ভোট দেওয়া আর ভোট না দেওয়ার আইনগত তাৎপর্য সমান। দেশগঠনে এর কোনো ভূমিকা নেই।

নোটা-ভোটারদের মনে রাখা প্রয়োজন যে আইনের দৃষ্টিতে নোটার বোতাম টেপার অর্থ হলো তাঁরা নিজেরা স্বেচ্ছায় নিজেদেরকে অগ্রাহ্য করতে বলছেন। কারুর সুপরিকল্পিত প্রচারের শিকার হয়ে নিজেই নিজেকে গুরুত্বহীন ঘোষণা করার কাজ আশা করি কোনো বুদ্ধিমান মানুষ করবেন না।

অর্থাৎ বর্তমানে যাঁরা নোটাতে ভোট দিতে বলছেন, তাঁরা মূলত মানুষকে নিজেদের ভোট নষ্ট করতে বলছেন এবং চাইছেন দেশের মানুষ দেশ ও রাষ্ট্রগঠনে কোনো ভূমিকাই না নিক। তাঁরা চাইছেন যে বিভিন্ন দলের যারা ডেডিকেটেড ভোটার তেমন কিছু অল্পসংখ্যক লোকই দেশে বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচনের ভাগ্য নির্ধারণ করুন। কারণ বহু লোক যদি নোটাতে ভোট দেন তবে সেই ভোটগুলো বাতিল হবে, ফলে যে ক'টি কমসংখ্যক ভোট নানা দলের মধ্যে ভাগ হবে, তার ভিত্তিতেই সরকার গঠন হবে।

উত্তরবঙ্গের কালচিনিতে ২০১৬-র বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি টিএমসির কাছে হেরে যায় মাত্র ১৫১১ ভোটে যেখানে নোটা ভোট ছিল ৪৫২৪টি। পশ্চিমবঙ্গে এরকম ২৩টি বিধানসভা কেন্দ্র আছে যেগুলিতে জয়ের ব্যবধানের চেয়ে নোটা ভোটের সংখ্যা ছিল বেশি। এই কেন্দ্রগুলিতে যদি নোটা ভোটগুলি দ্বিতীয় স্থানাধিকারী প্রার্থীর ঝুলিতে পড়ত, তবে নির্বাচনের ফলাফলই অন্যরকম হতে পারত। কেউ হয়তো বলবেন যে, এর মানে হলো, এইসব কেন্দ্রে নোটা ভোটই নির্ণায়ক ভূমিকা নিয়েছে। কিন্তু বাস্তব হলো, যেহেতু নোটা ভোট আসলে ভোট না দেওয়ার সমতুল্য, সেহেতু এই কেন্দ্রগুলিতে আসলে নোটা ভোট দাতাদের ঔদাসীন্যের কারণে হয়তো কেন্দ্রের বেশিরভাগ মানুষের অপছন্দের প্রার্থীও নির্বাচিত হয়ে যেতে পেরেছেন। এ আসলে গণতন্ত্রের পরাজয়ই।

অর্থাৎ এক কথায় বলতে গেলে নোটা-প্রচারকারীরা চাইছেন দেশের সাধারণ জনগণ মনের শান্তির জন্য ভোট দিক কিন্তু দেশগঠনে তাদের ভোটের কোনো ভূমিকা না থাকুক। কিন্তু সাধারণ নিরপেক্ষ ভোটারের কর্তব্য হলো দেশ গঠনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করা। ভোট দেওয়া তাঁদের অধিকার শুধু নয়, কর্তব্যও। নোটা নয়, বরং নিজেদের বিবেচনাশক্তি কাজে লাগিয়ে যে রাজনৈতিক দলকে অপেক্ষাকৃত কম খারাপ বলে মনে হবে, তাকেই ভোট দিন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত যথার্থ পথনির্দেশ করেছেন যে, নোটাতে ভোট দিলে অপেক্ষাকৃত অনুপযুক্ত যে-ব্যক্তি নির্বাচনে লড়ছেন তাঁর পথকেই সুগম করা হয়।

নোটা-ভোটারদের মনে রাখা প্রয়োজন যে আইনের দৃষ্টিতে নোটার বোতাম টেপার অর্থ হলো তাঁরা নিজেরা স্বেচ্ছায় নিজেদেরকে অগ্রাহ্য করতে বলছেন। কারুর সুপরিকল্পিত প্রচারের শিকার হয়ে নিজেই নিজেকে গুরুত্বহীন ঘোষণা করার কাজ আশা করি কোনো বুদ্ধিমান মানুষ করবেন না। ■

ভাগচাষিদের আরও বেশি ক্ষমতায়নে সরকার দায়বদ্ধ : পীযূষ গোয়েল

নির্বাচনী ইস্তাহারে কৃষকদের জন্য একগুচ্ছ প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বিজেপি। এই প্রতিশ্রুতি কীভাবে রূপায়িত হবে, এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন পীযূষ গোয়েল । সাক্ষাৎকারটি স্বস্তিকায় প্রকাশিত হলো। —স. স্ব.



□ প্রধানমন্ত্রী কৃষি যোজনার ক্ষেত্র বিস্তারের পরবর্তী পদক্ষেপ কী? সমস্ত কৃষক কি এর আওতায় আসবেন এবং এর সুযোগ বিস্তারের বুনিয়াদটাই বা কী হবে?

● আমরা এই যোজনার আওতায় দু' হেক্টর কৃষিজমিগুলিকে রেখেছি। এবং আমাদের পরিকল্পনা রয়েছে বারো কোটি কৃষক পরিবারকে এর মধ্যে আনা। জোরকদমে এই কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। এক কিস্তি ইতিমধ্যেই দেওয়া হয়ে গিয়েছে এবং আমরা রাজ্যগুলিকে বারবার বলছি সুবিধাভোগীদের তালিকাটি আমাদের সঙ্গে বিনিময় করার জন্য। একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা আমাদের চোখে ধরা পড়েছে, সেটি হলো বহু এলাকাতেই কৃষকদের হয়তো বিশাল জমি রয়েছে কিন্তু বৃষ্টি-সমস্যায় তাঁরা ভুগছেন, অর্থাৎ খরা কিংবা বন্যাকবলিত হয়ে পড়ছে এলাকাটি। যেমন বুন্দেলখণ্ডের মতো জায়গা অত্যন্ত শুষ্ক। বৃহৎ কিংবা ক্ষুদ্র, উভয় স্তরের কৃষকদেরই যৌথ উদ্যোগে ভারত আজ খাদ্যশস্য ও অন্যান্য কৃষিপণ্যে স্বনির্ভর হয়েছে। তাই প্রতিটি কৃষক যেন এই প্রকল্প থেকে উপকৃত হন। প্রায় তিন কোটি কৃষক এর আওতায় রয়েছেন।

□ কিন্তু ভাগচাষি কিংবা ক্ষেতমজরদের কীভাবে এই প্রকল্পের আওতায় আনবেন?

● তাঁদের আরও বেশি ক্ষমতায়নের জন্য আমাদের সরকার সর্বদাই সচেষ্ট। ভাগচাষীদের একটি সামগ্রিক সূচি তৈরির কাজ সরকার করছে, যাতে তাঁদের হাতে আরও সুবিধা তুলে দেওয়া যেতে পারে। ক্ষেতমজুরদের তথ্য আমাদের হাতে নেই। অন্য দলের ইস্তাহারের সঙ্গে আমাদের ইস্তাহারের বহু যোজন পার্থক্য রয়েছে। আমরা যা বলি তা করে দেখানোর চেষ্টা করি।

□ প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকদের জন্য অবসরকালীন ভাতা প্রকল্পে কীরকম অর্থ প্রদান করা হতে পারে?

● সরকারে প্রত্যাবর্তন করে আমরা এই বিষয়টিতে হাত দেব। প্রধানমন্ত্রী কৃষি-যোজনার অন্তর্গত কৃষকদের তালিকাটি এই মুহূর্তে আমাদের হাতে রয়েছে। অবসরকালীন ভাতা প্রকল্পে এটি সহায়ক হবে। এটা খুব দুর্গাগ্যজনক যে বহু রাজ্য দরিদ্র কৃষকদের এই আর্থিক সুবিধাকে অনুমোদন দেয় না। এঁদের উন্নতিকল্পেও তাঁদের রাজনীতিকরণ কেন?

□ যাঁরা সময়মতো শোধ দিতে পারবেন এক লক্ষ পর্যন্ত কৃষি ঋণের ক্ষেত্রে তাঁদের সুদ মকুব করে দেওয়া হবে, এই সিদ্ধান্তের বুনিয়াদ কী?

● আর্থিক লাভের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র চাষিরা সর্বদাই নানা বাধার সম্মুখীন হন। সুদ দিতে গিয়ে প্রায়শই তাঁরা বাড়তি চাপ নেন। তাঁর ওপরে ঋণের সময়সীমা থাকে এক থেকে পাঁচ বছর অবধি। প্রতিটি কৃষি মরশমেই যে তাঁর ঋণশোধে সাবলম্বী থাকেন তেমনও নয়। সুতরাং ঋণশোধের চাপও তাঁদের ওপর থাকে। এটা অবশ্যই তাঁদের অপ্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক চাপ। তাঁরা দশবছরের ওপর সুদের ভরতুকি দিলে, সমস্ত ঋণটাই তো মকুব হয়ে যায় (অর্থাৎ সরকারের ঘরে ধার দেওয়া টাকাটা উঠে আসে)।

□ এই খাতে সরকারের ব্যয় কীরকম? আর এর জন্য টাকাটাই বা আসবে কীভাবে?

● আমাদের প্রতিটি প্রতিশ্রুতির সংস্থান বাজেটে রয়েছে। আমরা আয় বাড়াবার চেষ্টায় রয়েছি এবং এই সমস্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবার সামর্থ্য আমাদের আছে। দেশ আরও সততার সঙ্গে এগিয়ে যাবে এবং করের হার না বাড়িয়েও এর ক্ষেত্র বিস্তৃততর হবে। 'উজ্জ্বলা', 'সৌভাগ্য', 'শৌচালয় নির্মাণ'-এর মতো আমাদের বহু প্রকল্প আমরা সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করেছি। এর জন্য নতুন করে বাজেটের সাহায্যের দরকার হবে না। সুতরাং দরিদ্র ও কৃষকদের সেবা করার মতো নবতর ক্ষেত্রে হাজার হাজার কোটি টাকা এখন আমাদের সংস্থানে রয়েছে।

□ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য আপনি নিম্নহারের করের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। বিস্তারিতভাবে যদি এবিষয়ে বলেন।

● প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে আর্থিকভাবে স্বস্তি দেওয়ার জন্য এক পদ্ধতি থেকে আরেক পদ্ধতি ভেবেছেন। প্রধানমন্ত্রী সততাকে সম্মানের কথা বলেছেন। এবং সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ করদাতাকেও সম্মান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আমরা বিশ্বাস করি আমাদের করদাতা ও ব্যবসায়ীরা সাধারণত সৎ মানুষ এবং তাঁরাই কর্মসংস্থান, সম্পদ ও পরিকাঠামো নির্মাণ করেন। আমরা চাই মধ্যবিত্ত সমাজের পকেটে আরও অর্থ থাকুক, যাতে তাঁদের পরিবার সন্তান ও পিতামাতার উন্নতিকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যয় করতে পারেন।

□ ১০০ লক্ষ কোটি টাকা আর্থিক বিনিয়োগের একটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রকল্প আপনার রয়েছে। কোথা থেকে এই টাকা আসবে এবং আমাদের অর্থনীতি কি এই সুবিশাল বিনিয়োগের জন্য তৈরি?

● আর্থিক উৎসগুলি জোর করে নির্মাণ করা যায় না। মানুষ সেই ধরণের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাতেই বিনিয়োগ করতে চাইবেন, যেখানে সম্ভাবনা আছে, আমাদের সরকার যা প্রস্তাব করছেন। এই তহবিলের পরিকল্পনায় বাজেটের সাহায্য অবশ্যই রয়েছে। সড়ক, বন্দর, রেল ইত্যাদি ক্ষেত্রগুলি ক্রমবিস্তৃত হওয়ায় আমরা বিনিয়োগের সম্ভাবনা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ উভয়ই সৃষ্টি করতে পেরেছি। ১০০ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগ পরিকাঠামোয় শ্রম ও কর্মসংস্থান থেকেই ২৫-৩০ লক্ষ কোটি টাকা উঠে আসবে। আমরা ক্ষেত্রভিত্তিক পরিকল্পনা করেছি। যেমন ধরন রেলওয়ের ক্ষেত্রে ২৫ লক্ষ কোটি টাকার পরিকল্পনা রয়েছে, যদিও আপাতত ৮ লক্ষ কোটি টাকার মতো সংস্থান করা গিয়েছে। আমরা পাঁচ বছরের লক্ষ্য নিয়ে এগোচ্ছি। ■

উনিশের লোকসভা নির্বাচন শক্তিশালী ভারত নির্মাণের অঙ্গীকার

ড. সুদীপ ঘোষ

আজ আমরা এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। যেখানে দাঁড়িয়ে আমাদের বিচার করতে হবে আগামী পাঁচ বছর আমরা দেশের শাসনক্ষমতা ভারতীয় জনতা পার্টির হাতে তুলে দেব, না নীতিহীন, লক্ষ্যহীন, আদর্শহীন এক 'মজবুর' বিরোধীদের হাতে তুলে দেব যাদের লক্ষ্য শুধুমাত্র মোদীজীকে সরানো এবং যারা তাদের নিজের নিজের অঞ্চলে প্রাইভেট লিমিটেডের মতো নিজের জমিদারি চালিয়েছেন এবং যারা বুঝতে পেরেছেন যে মোদীজী যদি আর একবার আসেন তাদের এই প্রাইভেট ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবে। যারা এখনো নিজেদের প্রধানমন্ত্রী ঠিক করতে পারেনি এবং যতই নির্বাচন এগিয়ে আসছে ততই এদের আরও এলোমেলো মনে হচ্ছে। তাই আজ আমাদের ঠিক করতে হবে আমরা 'মজবুর' সরকার চাই না 'মজবুত' সরকার চাই। ব্যালটের বোতামে চাপ দেওয়ার আগে আমাদের ভাবতে হবে আমরা পাঁচ ট্রিলিয়ন অর্থনীতির দেশ হবো। আমরা 'সুপার পাওয়ার' হবো নাকি আগামী পাঁচ বছর চীন, পাকিস্তানের গোলামি করবো। আমরা জল, স্থল, অন্তরীক্ষে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করবো নাকি বহিরাগত বিদেশিদের আশ্রয় দিয়ে অর্থনৈতিক মেরুদণ ভেঙে ফেললো।

আমরা যারা বিজেপির মতাদর্শে বিশ্বাস করি তারা 'এক দেশ এই আইনের কথা বলি', কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বিলোপ করার কথা বলি, অমানবিক তিন তালাকের বিরোধিতা করি, অখণ্ড ভারতের কথা বলি, দেশকে মা মনে করি। মা দুর্গা মনে করে পূজা করি। আমরা মনে করি ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র কোনটাই মানুষের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তি এনে দিতে পারবে না। কেননা এই দুটো ব্যবস্থাতেই মানুষকে ও মানবিক মূল্যবোধকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। অধ্যাত্মবাদের কথা বলা হয়নি। মানুষের জীবন প্রকৃত শান্তি ও সমৃদ্ধি এনে দিতে পারে তৃতীয় একটি দর্শন 'একাত্ম মানবদর্শন'। যেখানে মানুষকেই সবথেকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

আমরা মনে করি স্বাধীনতার পর ৭০ বছরের মধ্যে প্রায় ৫৫ বছর অতিবাহিত হয়েছে একটি পরিবারের তুষ্টিকরণে। দেশের সাধারণ মানুষকে ইচ্ছে করে গরিব করে রেখে দেওয়া হয়েছে, ইচ্ছে করে অন্ধকারে রেখে দেওয়া হয়েছে, ইচ্ছে করে শুধু ভোটার করে



রেখে দেওয়া হয়েছে। দেশের ইতিহাস আজ সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার ইতিহাস। দেশের ইতিহাস আজ বঞ্চনার ইতিহাস। আমরা মনে করি মোদীজীই পারেন এই অচলায়তন ভেঙে নতুন সূর্যোদয় ঘটাতে। তিনিই পারেন দেশের হৃতগৌরব ফিরিয়ে আনতে, তিনিই পারেন দেশকে বিশ্বআসনে বসতে।

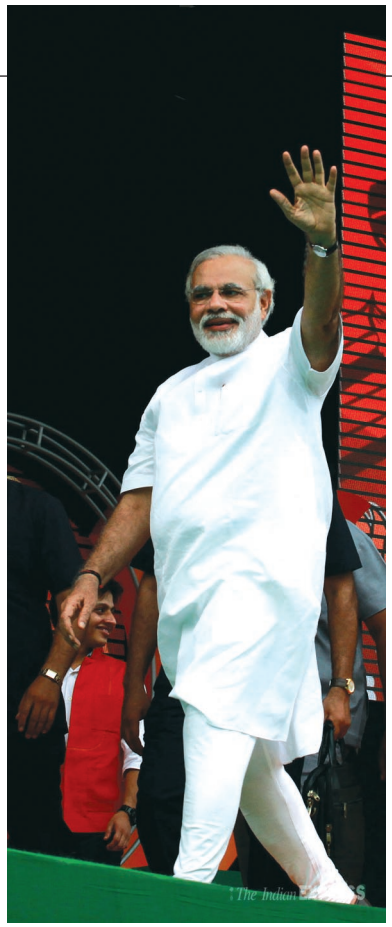
পশ্চিমবঙ্গে বর্তমান শাসক দলের নেতা-নেত্রীরা গ্রামেগঞ্জে বলে বেড়াচ্ছেন বিজেপি এলে ভিটেমাটি বেচে দেবে। বিজেপি এলে দাঙ্গা লাগবে, বিজেপি এলে মুসলমানদের তাড়িয়ে দেওয়া হবে। আমি তাদেরকে এই লেখার মধ্য দিয়ে বলতে চাই ভারতবর্ষের অধিকাংশ রাজ্যে বিজেপি শাসনক্ষমতায় আছে। সেখানে কি দাঙ্গা বাঁধছে? সেখানে কি মুসলমানদের তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে? বরঞ্চ সেইসব রাজ্যের মুসলমানদের অর্থনৈতিক অবস্থা এ রাজ্যের থেকে অনেক ভালো। মোদীজী বলেছেন— 'সব কা সাথ সব কা বিকাশ'। আর বিজেপি ভিটেমাটি বেচে দিতে আসেনি, বরং ভিটেমাটি গড়ে দিতে এসেছে। সেইজন্যই তো প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার মাধ্যমে দেশে ১ কোটি ৩০ লক্ষ ঘর তৈরি হয়েছে যেখানে শৌচালয়, বৈদ্যুতিকরণ, এলপিজি-র সুবিধা রয়েছে। মোদীজী মানুষের ঘর বেঁধে দিতে এসেছেন, ভেঙে দিতে নয়।

পশ্চিমবঙ্গের ঘরে ঘরে এই বলে প্রচারের ঝড় উঠুক যে বিজেপি মানে গরিব মানুষের জন্য ২ টাকা কেজি দরে চাল। বিজেপি মানে ঘরে ঘরে শৌচালয়, বিজেপি মানে গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ, বিজেপি মানে বিশ্ব অর্থনীতিতে ভারতের ষষ্ঠস্থানে উঠে আসা। বিজেপি মানে শত্রুদেশের মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়া, বিজেপি মানে গরিব মা-বোনেদের ঘরে ঘরে এলপিজি সংযোগ, বিজেপি মানে গরিব মানুষের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট। বিজেপি মানে সরাসরি উপভোক্তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা, বিজেপি মানে দেশের সীমান্তে সেনাদের জন্য বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট, বিজেপি মানে এক দেশ এক কর, বিজেপি মানে বিপিএল তালিকাভুক্ত ১০ কোটি পরিবারের জন্য 'আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প'।

বিজেপি মানে ইমামদের ভাতা প্রদানের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ নয়। বিজেপি মানে উৎসব আর ক্লাবকে অর্থ প্রদানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে দেওয়া নয়। বিজেপি মানে পঞ্চায়েত ভোটে মানুষ খুন নয়।

তাই আসুন সবাই মিলে আমরা এক শপথ নিই যে আগামী কুরুক্ষেত্রের ধর্মযুদ্ধে মোদীজীকে ৩০০-র বেশি আসন দিয়ে গণতন্ত্রের মন্দিরে পাঠাই ও এক মজবুত সরকার গঠনের মাধ্যমে দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাই। মোদীজীর আগামী ৫ বছর যেন ইতিহাসের পাতায় গৌরবের সঙ্গে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকে। ■

মমতা ম্যাজিক না মোদী ঝড় পশ্চিমবঙ্গে জিতবে কে?



নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ সারা দেশে প্রথম পর্যায়ের ভোটগ্রহণ শেষ হয়েছে। লড়াই মূলত বিজেপি এবং কংগ্রেসের মধ্যে হলেও, বিজেপি এবার সর্বশক্তি নিয়ে নির্বাচনী যুদ্ধে অবতীর্ণ। পশ্চিমবঙ্গ এবং ওড়িশায় বিজেপির এবার বিশেষ নজর। বস্তুত, দুই রাজ্যেই বিজেপি ভালো ফলের প্রত্যাশী।

পশ্চিমবঙ্গ কবি-শিল্পী-সাহিত্যিকের রাজ্য। দেশের মধ্যে একমাত্র রাজ্য যেখানে বিংশ শতাব্দীতে নবজাগরণ হয়েছিল। কিন্তু আজকের পশ্চিমবঙ্গে হিংসা আর খুনোখুনি ছাড়া আর কিছু নেই। সেই পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচনী যুদ্ধের জন্য তৈরি। গত সত্তর বছরে পশ্চিমবঙ্গে সিপিআই আর কংগ্রেস ছাড়া আর কোনও সর্বভারতীয় দল ছাপ ফেলতে পারেনি। এবার বিজেপি রাজ্যে দারুণভাবে সক্রিয়। যদিও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেছেন বিজেপিকে রাজ্যে ঢুকতে দেবেন না। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও বেশ কিছু ভোট-বিশেষজ্ঞের দাবি, এবার বিজেপি ভালো ফল করবে। তবে ফল যাই হোক, এবারের নির্বাচন এরাজ্যে যে মোদী বনাম মমতা— সে ব্যাপারে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই।

২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তার নানান সৃজনশীল প্রকল্প এবং সবাইকে নিয়ে চলার নীতির গুণে নিজেকে সর্বসাধারণের নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছেন। ব্যাপক বিরোধিতার মুখোমুখি হলেও মোদী সরকারের নীতি এবং সিদ্ধান্তগুলি সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে। সারা দেশের মতো পশ্চিমবঙ্গের মানুষও নরেন্দ্র মোদীকে এখন প্রগতি এবং উন্নয়নের সমার্থক হিসেবে দেখতে শুরু করেছেন। অনেকগুলি বিষয় রয়েছে যা পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির ভালো ফল করার যুক্তিকে সমর্থন করে।

২০১৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপি প্রথম পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলায় গ্রামপঞ্চায়েত গঠন করতে সমর্থ হয়। বিশেষ করে জনজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে বিজেপি ৪০ শতাংশ আসনে জয়ী হয়। এই জয় লোকসভা নির্বাচনে বিজেপিকে যে জনজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে এগিয়ে রাখবে তাতে সন্দেহ নেই।

সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশিদের অবৈধ অনুপ্রবেশ এখন পশ্চিমবঙ্গের সব থেকে বড়ো সমস্যা। অনুপ্রবেশের ফলে রাজ্যে মুসলমান জনসংখ্যা বিপজ্জনকভাবে বাড়ছে। মুসলমান জনসংখ্যা বাড়ার জন্য যে শাসক দল এবং অন্য ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলির ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতিই দায়ী সে ব্যাপারে এখানকার মানুষের কোনও সন্দেহ নেই। ফলে বাড়ছে বিজেপির জনসমর্থন। বিজেপির শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য হিন্দু সংগঠনগুলি ঐক্যবদ্ধ ভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছে।

বাঙ্গালিরা সাধারণভাবে সংস্কৃতিমনস্ক। তারা সবসময় নিজেদের সংস্কৃতি তুলে ধরার চেষ্টা করেন। কিন্তু সম্প্রতি দুর্গাপুজো এবং সরস্বতী পুজোয় শাসক দলের আরোপিত নানান বিধিনিষেধের কারণে এখানকার মানুষ ক্ষুব্ধ। নির্বাচনী যুদ্ধে জিততে মানুষের এই ক্ষোভকে হাতিয়ার করেছে বিজেপি। এছাড়া বিজেপির তূণে রয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ তৃণমূল দলের অধিকাংশ নেতা-মন্ত্রীর দুর্নীতির অস্ত্র। কর্মসংস্থানের অভাব, নিরক্ষরতা, প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা, হিন্দুদের ওপর মুসলমানদের ক্রমবর্ধমান অত্যাচার— এই ইস্যুগুলিও পশ্চিমবঙ্গে দারুণভাবে সক্রিয়। সুতরাং বিজেপির ভালো ফল করার সম্ভাবনা এবার প্রবল।

অন্যদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাবমূর্তি আগের থেকে ম্লান হলেও সম্পূর্ণ মুছে যায়নি। এখনও পশ্চিমবঙ্গের মানুষের একটা বড়ো অংশ মমতায় আস্থাবান। একথা অনস্বীকার্য মমতার যারা কমিটেড ভোটার তাদের একটা বড়ো অংশ তৃণমূলকৃত নানাবিধ দুর্নীতির সুবিধাভোগী। এদের সঙ্গে রয়েছে মুসলমানরা। মুসলমান ভোটব্যাঙ্ক অক্ষত রাখতে মমতা চিরকাল তুষ্টিকরণের রাজনীতি করেছেন। সেই ভোটব্যাঙ্কে যদি সিপিএম এবং কংগ্রেস ভাগ বসায় তাহলে মমতার সমূহ বিপদ। ভাগ বসাতে পারে বিজেপিও। কারণ তিন তালাক বিরোধী বিল পাশ করে বিজেপি ইতিমধ্যেই শিক্ষিত-মধ্যবিত্ত মুসলমান মেয়েদের মন জয় করতে সমর্থ হয়েছে। এছাড়া, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় পশ্চিমবঙ্গের বহু মুসলমান বাড়ি পেয়েছেন। মুদ্রা যোজনার লাভও পেয়েছেন। সুতরাং মমতার সংকট বহুমুখী। কিন্তু তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জেতার জন্য বৈধ অবৈধ— যে কোনও কাজই করতে পারেন। তাই ভোট বিশেষজ্ঞদের অভিমত, মানুষ যদি ভোট দিতে পারেন তাহলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিদায়ের ঘণ্টা বেজে যাবে। না হলে কিছুই হবে না। পশ্চিমবঙ্গ যেখানে ছিল থেকে যাবে যেখানেই। ■

রপ্তানি বাণিজ্যে শিখর স্পর্শ করল ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি।। এই সেদিনও কয়েকজন অর্থনীতিবিদ দেশের জিডিপি প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতির কথা বলতেন। রপ্তানি বাড়াতে মোদী সরকার ব্যর্থ বলে চিলচিৎকার জুড়ে দিত মিডিয়া। সম্প্রতি বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রক জানিয়ে দিয়েছে চলতি অর্থবর্ষে ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যে ৭.৯৭ শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছে। এই বৃদ্ধি ৫৩৫.৪৫ বিলিয়ন ডলারের সমান। চলতি অর্থবর্ষে আমদানির পরিমাণ ৬৩১.২৯ বিলিয়ন ডলার। এক্ষেত্রে বৃদ্ধি ৮.৪৮ শতাংশ। মন্ত্রকের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'এই তথ্য আরবিআইয়ের অনুমোদিত। পরে যদি প্রয়োজন হয় তাহলে আরবিআই আরও একবার পরীক্ষা করতে পারে।' মন্ত্রকসূত্রে জানা গেছে, চলতি আর্থিক বর্ষে মোট ২,



২৬,১৩৮.৭৬ কোটি টাকার রপ্তানি হয়েছে। গত আর্থিক বর্ষে মোট রপ্তানি হয়েছিল ১৯০,৬১৯.২৫ কোটি টাকার।

এবার জৈব ও অজৈব রাসায়নিক, ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য এবং ওষুধ রপ্তানিকারীরা সব থেকে বেশি ব্যবসা করেছেন। এদিকে, আমদানি ক্ষেত্রে এ বছর ইতিবাচক বৃদ্ধি ১৮.২৩ শতাংশ। যার অর্থমূল্য ৩,০১,৮১৪.০৫ কোটি টাকা। গত বছর যা ছিল ২,৭৮,৪৪১.২৪ কোটি টাকা। মন্ত্রক থেকে এও বলা হয়েছে, চলতি বছরের মার্চ মাসের বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ ১০.৮৯ বিলিয়ন ডলার। আর, চলতি বছরের সামগ্রিক বাণিজ্য ঘাটতি ৯৫.৮৫ বিলিয়ন ডলার। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০২০ সালের মধ্যে ভারতের রপ্তানি বাণিজ্য ৯০০ বিলিয়ন ডলারে নিয়ে যেতে চান। এই লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে পারলে সারা বিশ্বের মোট রপ্তানির ৩.৫ শতাংশ হবে ভারত থেকে। এখন হয় মাত্র ২ শতাংশ।

সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা থেকে মাত্র কয়েক ধাপ দূরে গ্রামীণ ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ স্বচ্ছ ভারত মিশন ভারত সরকারের সব থেকে উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রকল্প। মাত্র পাঁচ বছরেই এই প্রকল্প বহু মানুষের জীবন বদলে দিয়েছে। মাত্র চারটি রাজ্যে কাজ সম্পূর্ণ হলেই গ্রামীণ ভারতকে স্বচ্ছ বলা যাবে। যে চারটি রাজ্যে কাজ এখনও সম্পূর্ণ হয়নি সেগুলি হলো : ওড়িশা, গোয়া, তেলেঙ্গানা এবং পশ্চিমবঙ্গ। সরকারের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ওড়িশায় স্বচ্ছ ভারত মিশনের ৮৪.৩৫ শতাংশ কাজ শেষ হয়েছে। গোয়ায় হয়েছে ৭৬.২২ শতাংশ, তেলেঙ্গানায় ৯৫.৮৯ শতাংশ এবং পশ্চিমবঙ্গে ৯৯.৯৭ শতাংশ। কেন্দ্রীয় সরকারের ওয়েবসাইট থেকে জানা যাচ্ছে, সারা ভারতে ১৫,৭২,৮২,৫৬৪টি বাড়িতে শৌচালয় নির্মাণ করা সম্ভব হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গের মাত্র ০.৩ শতাংশ বাড়িতে নিজস্ব শৌচালয় নেই। কেন্দ্রীয় সরকার চলতি বছরের অক্টোবর মাসের মধ্যে স্বচ্ছ ভারত মিশনের কাজ শেষ করার পরিকল্পনা করেছিল। বকেয়া কাজ নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই শেষ করা যাবে বলে



সরকার মনে করছে। এর ফলে বিজেপি-সহ এনডিএ-র সদস্য দলগুলি যে লোকসভা নির্বাচনে বিশেষ সুবিধা পাবে সেকথা বলাই বাহুল্য। এদিকে ওড়িশায় স্বচ্ছ ভারত মিশনের কাজে গাফিলতিতে ক্ষুব্ধ রাজ্যের বিজেপি নেতৃত্ব। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং ওড়িশার বিজেপি নেতা রাজ্যের বিজেডি সরকারের সমালোচনা করে বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গেও একটি অ-বিজেপি সরকার ক্ষমতাসীন। অথচ স্বচ্ছ ভারত মিশনের কাজ যেখানে ওড়িশার থেকে অনেক ভালো হয়েছে।' সামগ্রিকভাবে সারা দেশে স্বচ্ছ ভারত মিশনের কাজে ব্যাপক অগ্রগতি হয়েছে। প্রকল্পের কাজ শুরু হবার আগে জম্মু ও কাশ্মীর, বিহার, রাজস্থান এবং ঝাড়খণ্ডে মাত্র ৩০ শতাংশ পরিবারের নিজস্ব শৌচালয় ছিল। এখন ১০০ শতাংশ পরিবারের নিজস্ব শৌচালয় আছে। এ প্রসঙ্গে এক সরকারি আধিকারিক বলেন, 'লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করার ব্যাপারে আমরা আত্মবিশ্বাসী। প্রকল্পের কাজ শেষ করার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারগুলিও আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করেছে।'



নারী শক্তির জয়গানে মুখরিত স্বস্তিকার নববর্ষ সংখ্যার প্রকাশ অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ স্বস্তিকা পত্রিকার ১৪২৬ নববর্ষ সংখ্যার উন্মোচনে মাতৃশক্তি জাগরণের সাক্ষী থাকল কলকাতার ঐতিহ্যমণ্ডিত শোভাবাজার নাটমন্দির। ১৩ এপ্রিল অপরাহ্নে স্বস্তিকার পাঠক-পাঠিকাদের ভিড়ে উপচে পড়া নাটমন্দিরে ১৪২৬ বঙ্গাব্দের স্বস্তিকা সম্মানে ভূষিত করা হলো বিশিষ্ট সাহিত্যিক, গবেষিকা তথা স্বনামধন্য সাংবাদিক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সুযোগ্য কন্যা এষা দে-কে। অনুষ্ঠানে স্বস্তিকা পত্রিকার কিংবদন্তী সম্পাদক ভবেন্দু ভট্টাচার্য নামাঙ্কিত স্মারক বক্তৃতা করেন অধ্যাপিকা রমা বন্দ্যোপাধ্যায়। সভানেত্রীর আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক অধ্যাপিকা সুমিত্রা ঘোষ। নারীশক্তির প্রতীক এই তিন বিশিষ্টজনের সঙ্গে যোগ্য সঙ্গত করে অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন লেখিকা সুতপা বসাক ভড়। এছাড়াও মঞ্চে ছিলেন স্বস্তিকার প্রকাশক সারদাপ্রসাদ পাল।

মঞ্চে মর্যাদা পুরুষোত্তম রামচন্দ্র ও প্রাক্-জন্মদিন উপলক্ষে রাখা আম্বেদকরের ছবিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন ও প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয়। ১৪২৬ বঙ্গাব্দে স্বস্তিকা সম্মানে ভূষিতা এষা দে তাঁর বক্তব্যে হিন্দু সমাজের কিছু প্রাথমিক দায়িত্ব ও কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দেন। ড. রমা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, তাঁর জাতীয়তা সম্পর্কিত লেখাগুলি অন্যান্য পত্র-পত্রিকা ছাপানোর সাহস দেখায়নি। স্বস্তিকা পত্রিকাতেই তিনি প্রথম তাঁর স্বদেশ সমাজ বিষয়ক ভাবনার খোরাক পান। তারপর থেকে তাঁর বক্তব্য মতামত প্রতিফলনের স্থান হিসেবে স্বস্তিকাকেই বেছে নিয়েছেন লেখিকা।

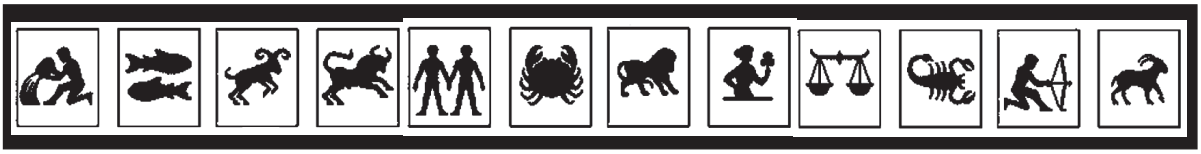
ইন্দিরা গান্ধীর সমালোচনা করে তিনি বলেন সংবিধান সংশোধনের সুযোগ নিয়ে তিনি 'সেকুলার' শব্দটি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করলেন, কিন্তু সংবিধান রচনার দিনক্ষণটি অবিকৃত রেখে দিলেন। যাতে করে সাধারণের ধারণা হয় আমাদের সংবিধান রচনা ইস্তকই 'সেকুলার' শব্দটি ছিল। ইতিহাসের এই বিকৃতি নিয়ে সরব হন তিনি। সভানেত্রীর অভিভাষণে সুমিত্রা ঘোষ শোনালেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সঙ্গে ছোটোবেলা থেকেই তাঁর পরোক্ষ সংযোগের কথা এবং সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের দেখে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হওয়া ও ধীরে ধীরে জাতীয়তাবোধের প্রতি তাঁর আগ্রহ বাড়তে থাকার কাহিনি। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লেখালিখি করলেও নিজস্ব মতামত প্রকাশের স্থান ও প্রাণের ইন্ধন তিনি স্বস্তিকাতেই পান বলে মন্তব্য করেন শ্রীমতী ঘোষ।

অনুষ্ঠানে এষা দে-কে প্রদত্ত মানপত্র পাঠ করেন সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। ধন্যবাদ জানান সন্দীপ চক্রবর্তী। স্বস্তিকার ছোটোদের নবাঙ্কুর বিভাগে উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ অভিনন্দন জানানো হয় দুই খুদে— রূপসা দেবনাথ ও মৌনব দাসকে। তাঁদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্রীমতী মহুয়া ধর এবং স্বস্তিকার লেখক সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়।



■

সা প্তা হি ক রা শি ফ ল



২২ এপ্রিল (সোমবার) থেকে ২৮ এপ্রিল (রবিবার) ২০১৯। সপ্তাহের প্রারম্ভে মেষে রবি, বৃষে মঙ্গল, মিথুনে রাহু, ধনুতে বৃহস্পতি, শনি, কেতু, মীনে বুধ-শুক্র। ২২ এপ্রিল সন্ধ্যা ৬টা ৫২ মিনিটে বক্রী বৃহস্পতির বৃশ্চিকে প্রত্যাগমন। রাশি নক্ষত্র পরিক্রমায় চন্দ্র বৃশ্চিকে অনুরাধা নক্ষত্র থেকে মকরে ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে।

মেষ ঃ শারীরিক সুস্থতা, দৃঢ় প্রত্যয়ে সৃজনশীল কর্মে দক্ষতা ও বহুমুখী প্রতিভার প্রকাশ। স্বজন বাৎসল্য ও পারিবারিক সুস্থিতি তবে ভ্রাতা-ভগ্নী ও প্রতিবেশীর ক্ষেত্রকে শুভ বলা যায় না। গবেষণা, উচ্চশিক্ষা, শিল্পী, ভাস্কর, সাহিত্য পিপাসুদের সৃষ্টির নব উন্মেষ, বিত্ত ও আভিজাত্য গৌরব। প্রেমের পূর্ণতা। ভবিষ্যৎ প্রকল্পে অর্থ বিনিয়োগে লাভবান।

বৃষ ঃ স্বীয় প্রতিভায় প্রতিষ্ঠা, বিজাতীয় সান্নিধ্যে ভাগ্যের চাকার নতুন গতি লাভ। স্নেহ প্রবণতা, সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা, উদারতা, শিল্প- নিপুণতা, বান্ধবীর প্রতি আকর্ষণ, বিলাসব্যসন, সুখাদ্য ভোজন, গৃহ সরঞ্জামে ব্যয় ও শৌখিন ব্যবসায় বিনিয়োগে ইতিবাচক ফল। পারিবারিক কারণে গৃহ-জমি বিক্রয়ের সম্ভাবনা ও অর্থ-বিত্ত নিয়ে মনান্তর। ভ্রাতা-ভগ্নীর জ্ঞানভাণ্ডার ও বৈষয়িক উন্নতি।

মিথুন ঃ প্রতিভার ব্যাপ্তি, ব্যক্তিত্বের স্বতন্ত্র বিচারধারা, পেশাগত দক্ষতায়, বন্ধুত্বের বাতাবরণে বিত্ত ও আভিজাত্য বৃদ্ধি। বহুজনের সঙ্গসুখ। স্ত্রীর শরীরের যত্ন বিশেষত শরীরের ঊর্ধ্বাঙ্গের চোট-আঘাত বিষয়ে সতর্ক থাকা দরকার। উচ্চাভিলাষ ও প্রণয়ীর কারণে উদ্বেগ।

কর্কট ঃ জ্ঞান, পাণ্ডিত্য, বাগ্মিতা, শিল্প ও সৌন্দর্য সুধায় ভরপুর মন। ব্যবহারিজীবী, প্রযুক্তিবিদ, সাংবাদিক, শিল্পী, সাহিত্যিকের সৃজনশীলতায় নতুন চিন্তাভাবনার উন্মেষ। ভ্রাতা- ভগ্নীর সার্বিক প্রগতি এবং কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সহায়তা। মধুর বাক্য প্রয়োগে জনপ্রিয়তা। শরীরের ডানভাগের সতর্কতা প্রয়োজন।

সিংহ ঃ কর্ম ও প্রাণচঞ্চল সপ্তাহ। সন্তান-সন্ততির উচ্চশিক্ষার্থে প্রবাস। নতুন কর্মলাভের সম্ভাবনা। পাওনা আদায়ে সরলীকরণ। কর্মক্ষেত্রে আপোশহীন মনোভাব ও দক্ষতায় কর্তৃপক্ষের শংসা প্রাপ্তি। অপ্রত্যাশিত কোনো শুভ সংবাদ যা আনন্দ ও গর্বের। সামাজিক কল্যাণে ব্যয় ও সক্রিয় অংশগ্রহণ।

কন্যা ঃ সুখী জীবনপথে দোদুল্যমানতা পরিহার করুন, কর্মক্ষেত্রে মানসিক চাপ ও সহকর্মীদের বিরূপতায় প্রতিকুল পরিবেশ। সমালোচনায় শান্ত-সংযত থাকা শ্রেয়। পছন্দের ব্যক্তির সঙ্গে স্থায়ী সম্পর্ক স্থাপন। স্ত্রীর বুদ্ধিমত্তায় পারিবারিক শান্তি ও স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি। বিনিয়োগ অথবা নতুন কোনো কর্মপ্রকল্প স্থগিত রাখা বুদ্ধিমানের কাজ।

তুলা ঃ বিদ্যার্থী ও কর্মপ্রার্থীর সাফল্যে পরিবারের মুখ উজ্জ্বল ও গৃহসুখ। ব্যয়াধিক্য, মান-সম্মান ও মিত্রস্থানকে শুভ বলা যায় না। শল্যচিকিৎসক, ছাপাখানা, বাহনচালক, ট্যানেল খনন ও নির্মাণ শিল্পীদের কর্মদক্ষতা ও ধনার্জন ক্ষমতা বৃদ্ধি। ভ্রমণ ও জনহিতকর কর্মে সাফল্য। সন্তানের পড়াশুনায় মনঃসংযোগের অভাব। উচ্চস্থান থেকে পতনের সম্ভাবনা।

বৃশ্চিক ঃ বাসস্থান পরিবর্তন, ভৃত্যবিবাদ, বাড়ি-গাড়ি বিক্রয়, রমণীর সান্নিধ্যলাভ, অপযশ ও সময়ের অপচয়। দুরূহ কাজে সন্তানের সাফল্য। গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, সুধীজনের পদার্পণে মনমুগ্ধকর বাতাবরণ, পরিবারে নবাগতের আগমনের সম্ভাবনা। সপ্তাহের প্রান্তভাগে ঐশ্বরিক আশীর্বাদে ধনলক্ষ্মীর ধনবর্ষণ।

ধনু ঃ দৃঢ়তা, স্বাধীনচেতা ও মিষ্টতায় প্রতিকূলতার অবসানে গৃহ ও মাতৃসুখ, স্বজনের সঙ্গে সদ্ভাব, উচ্চব্যক্তিদের সঙ্গে হৃদ্যতা, পাণ্ডিত্যের প্রভাবে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা। সন্তান-সন্ততির আধুনিক মনস্কতায় অযৌক্তিক আচরণ ও অস্বাভাবিকতা। কর্মে অতিরিক্ত দায়িত্ব, মানসিক চাপ ও উদ্বেগ। গুরুজন ও দেব-দ্বিজে ভক্তি অটুট।

মকর ঃ মানসিক চাপ, শারীরিক ক্লান্তি, অবসাদ, উদ্বেগ। কর্মক্ষেত্রে নিজ অধ্যবসায় ও রমণীর সহায়তায় সাফল্য। ব্যবসায় বিনিয়োগ ও লিখিত চুক্তিতে বিরত থাকা শ্রেয়। চাকুরীপ্রার্থীর বিশেষ খবরে আনন্দ। আয়-ব্যয়ের সমতা রাখা কঠিন।

কুম্ভ ঃ পাণ্ডিত্য, প্রজ্ঞা, প্রতিভা ও প্রগতিতে তৃষ্ণার্ত হৃদয়ে সাফল্যের বারিধারা বর্ষণ। সমাজ প্রগতিমূলক কাজে সামাজিক স্বীকৃতি। মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার, খনিজ অনুসন্ধান, ক্রীড়াবিদ, কূটনীতিজ্ঞ প্রশাসনিক প্রধানদের মূল্যবোধের পরিসর বৃদ্ধি, প্রতিভার ব্যাপ্তি ও স্বীকৃতি। সপ্তাহের প্রান্তভাগে সুগার, প্রেসার ও থাইরয়েডের চিকিৎসার প্রয়োজন।

মীন ঃ ভক্তি, শ্রদ্ধা, নীতিনিষ্ঠা, কর্তব্যপরায়ণতা, বিনয়, নম্রতায় বিকশিত অন্তর। বয়স্কদের ক্রনিক রোগ নির্ণয়ে বিলম্ব। সন্তানের কর্মলাভ ও ব্যবসা বিস্তারে ব্যবসায়ীদের ব্যস্ততা, চাকুরেদের কর্ম পরিবর্তনের শুভ যোগ। একাধিক সূত্রে অর্থ উপার্জনের গতি ত্বরান্বিত হবে।

• জন্ম ছকের স্বাতন্ত্র্য ও দশা-অন্তর্দশা না জানায় কেবল গোচর ফল বর্ণিত হলো।

শ্রী আচার্য্য